জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০১৮

নিরীক্ষা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২২০ তম সংখ্যা

- একজন গোলাম সারওয়ার
- নির্বাচন: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ফেক নিউজ

নিরীক্ষা

২২০তম বিশেষ সংখ্যা : জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮

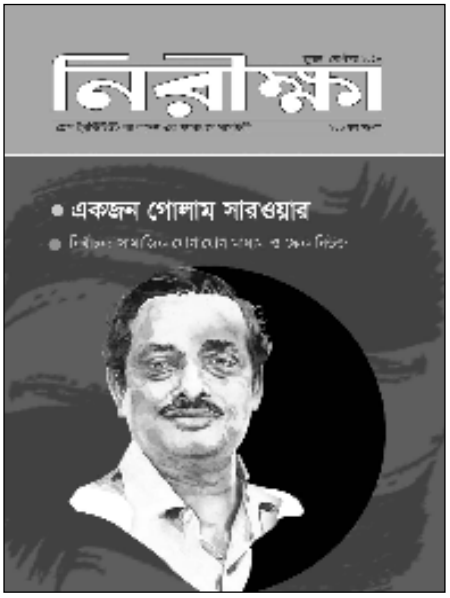

প্রথিতযশা সাংবাদিক ও পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান গোলাম সারওয়ার আজ আমাদের মাঝে নেই। আমরা তার বিদেহি আত্মার শান্তি কামনা করছি। গোলাম সারওয়ার ছিলেন একসময়ের স্বনামধন্য বার্তা সম্পাদক ও একজন সফল সম্পাদক। সাংবাদিকতা জগতে তিনি আইকন হিসেবে বিবেচিত। তিনি শুধু সম্পাদকই ছিলেন না, সামাজিক দায়িত্ব পালনেও ছিলেন সচেতন। এই কৃতী পুরুষের অকাল প্রয়াণে পিআইবি পরিবার ব্যথিত। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে পিআইবি'র গণমাধ্যম সাময়িকী নিরীক্ষার এ সংখ্যাটি সাজানো হয়েছে।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসন্ন। সে কারণেই গণমাধ্যম নির্বাচনি সংবাদ প্রচারে গুরুত্ব দেবে। সাংবাদিকদের নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি এবং সম্পাদনার জন্য এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাই এ সংখ্যায় নির্বাচন সাংবাদিকতা বিষয়েও বেশ কিছু প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে।

আশা করি সাংবাদিক, সাংবাদিকতার শিক্ষার্থী এবং নির্বাচন বিষয়ে যারা কাজ করবেন তাদের এ সংখ্যাটি প্রয়োজনে আসবে।

সম্পাদক
মো. শাহ আলমগীর

সহযোগী সম্পাদক
বিধান চন্দ্র কর্মকার

সহকারী সম্পাদক
মিজানুর রহমান
শাহেলা আক্তার
ড. জ্যোৎস্না রানী বিশ্বাস

শিল্প নির্দেশনা
মোমিন উদ্দীন খালেদ

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

সূ|চি|প|ত্র

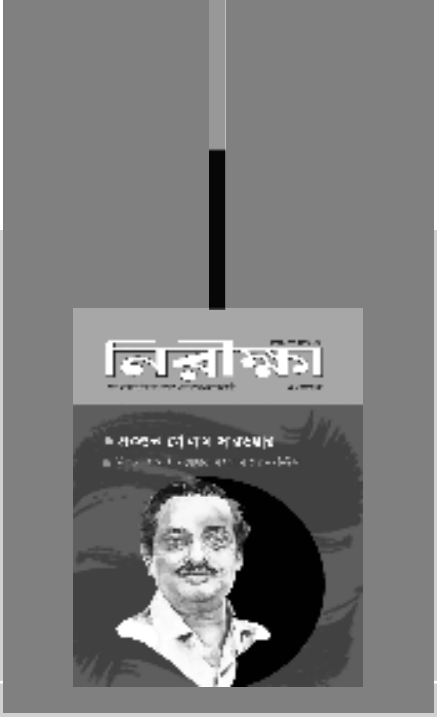

সমকালীন বাংলা সাংবাদিকতার একজন শ্রেষ্ঠ সম্পাদক ৭
আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

সাংবাদিক জগতে আলোকবর্তিকা ৯
হাসান শাহরিয়ার

আধুনিক সাংবাদিকতার পথিকৃৎ ১১
ড. গোলাম রহমান

একজন গোলাম সারওয়ার ১৩
শামীমা চৌধুরী

ফটো অ্যালবাম ১৭

নির্বাচন ও তথ্য অধিকার ২৪
কামরুল হাসান মঞ্জু

বিশ্বায়িত মিডিয়ার জমানায় রাজনীতিতে ইন্টারনেটের ভূমিকা ২৬
ড. মাহাবুবুর রহমান

নির্বাচন সাংবাদিকতা নিজস্ব অভিজ্ঞতা ২৯
প্রণব মজুমদার

দায়িত্বশীল গণমাধ্যম গণতন্ত্র, নির্বাচন ও নির্বাচনি প্রচারণার নিয়ামক শক্তি ৩২
শাহ্ শেখ মজলিশ ফুয়াদ

প্রসঙ্গ নির্বাচন: গণমাধ্যমের করণীয় ৩৫
ড. জ্যোৎস্নালিপি

৩৭ **নির্বাচন: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ফেক নিউজ**
মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী

৪১ **নির্বাচন ক্যাম্পেইনে কৌশলগত রাজনৈতিক যোগাযোগ: একটি পর্যালোচনা**
মোহা. মাহামুদুল হক

৪৪ **নির্বাচনবিষয়ক সাংবাদ: ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ**
আমীন আল রশীদ

৪৭ **গণমাধ্যম, নির্বাচন ও নারী**
মামুন অর রশিদ

৫১ **নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদন: শুরু থেকে শেষ**
মিনহাজ উদ্দীন

৫৪ **বাংলাদেশে রাজনৈতিক এবং নির্বাচনি সহিংসতার প্রবণতা ও ধরন**
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

৫৬ **নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের নীতি ও নৈতিকতা**
শুভ কর্মকার

৫৮ **জাতীয় পরিচয়পত্র বিষয়ক সেবা**
বিনয় দত্ত

৬০ **গণমাধ্যম সংবাদ**

৬৬ **পিআইবি সংবাদ**

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি'র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ২০ টাকা

নিরীক্ষা

২২০তম বিশেষ সংখ্যা
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৮

সূচিপত্র

‘সমকাল’ সম্পাদক গোলাম সারওয়ার পাড়ি জমালেন না-ফেরার দেশে। একে একে সব দেউটি নিভে যাচ্ছে আর ‘শ্রাবণের শেষাশেষি নিরাক পড়েছে’; নিস্তেজ দীপবর্তিকাগুলোর চারপাশে বিরাজ করছে নিবিড় অন্ধকার ও নিঃসীমতা

দেখুন- পৃষ্ঠা ৯

গোলাম সারওয়ার নিজেই বাংলাদেশের আধুনিক সাংবাদিকতার পথিকৃৎ। তিনি নিজেই আমাদের সাংবাদিকতা জগতে খেলার রঙিন পাতা, আলাদা ঈদ সংখ্যার মতো বিষয়গুলো যোগ করেছেন। সাংবাদিকতায় নতুন ‘ট্রেন্ড’ চালু করার বিষয়টি তিনি সবসময়ই যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন

দেখুন- পৃষ্ঠা ১২

জনগণ হয়তো গণমাধ্যমের কাছে সরাসরি সব সমস্যার সমাধান আশা করে না কিন্তু সমাধানের ব্যাপারে দ্রুত ও কার্যকর মতামত গঠনের জন্য সহায়তা পেতে চায়। সুতরাং গণমাধ্যমকে করতে হবে জনগণের জন্য সহজলভ্য। নাগরিকদের ভোটাধিকার রক্ষায় গণমাধ্যম প্রহরীর ভূমিকা পালন করে

দেখুন- পৃষ্ঠা ৩৬

নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং অন্য রিপোর্টের চেয়ে ভিন্ন। কারণ এখানে ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ তুলনামূলক বেশি। এ সময় সাংবাদিকের আসল ঝুঁকি নির্বাচনি সহিংসতার সংবাদ ও ছবি সংগ্রহ করতে গিয়ে হতাহত হওয়া। আর মূল চ্যালেঞ্জ সঠিক তথ্যটি মানুষকে জানানো। অনেক সময় সাংবাদিক যা দেখেন এবং যা জানেন তার সবটুকু তিনি মানুষকে জানাতে পারেন না। তার ওপর নানা মহলের চাপ থাকে। সেই চাপ মোকাবিলা করে সঠিক চিত্রটি মানুষকে জানানোই মূল চ্যালেঞ্জ

দেখুন- পৃষ্ঠা ৪৪

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত এবং এসোসিয়েট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নিরীক্ষা'র
আগস্ট বিশেষ সংখ্যা

বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু

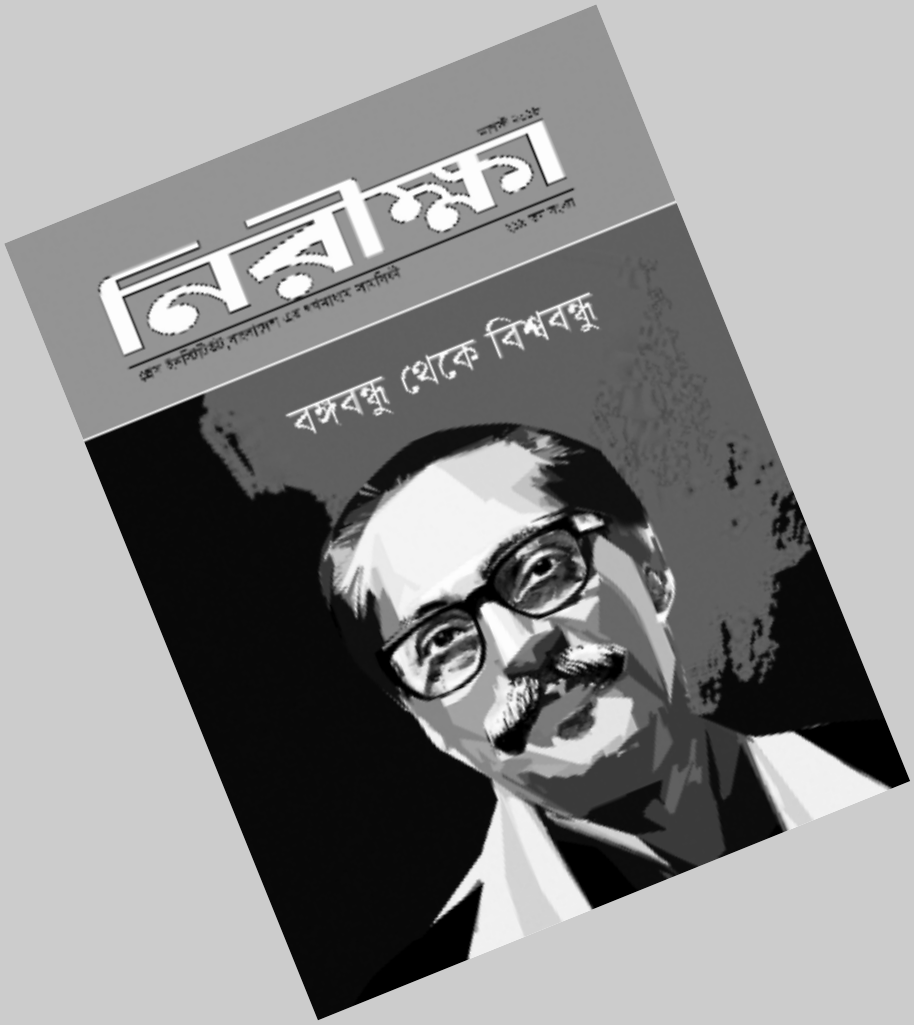

সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ

প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

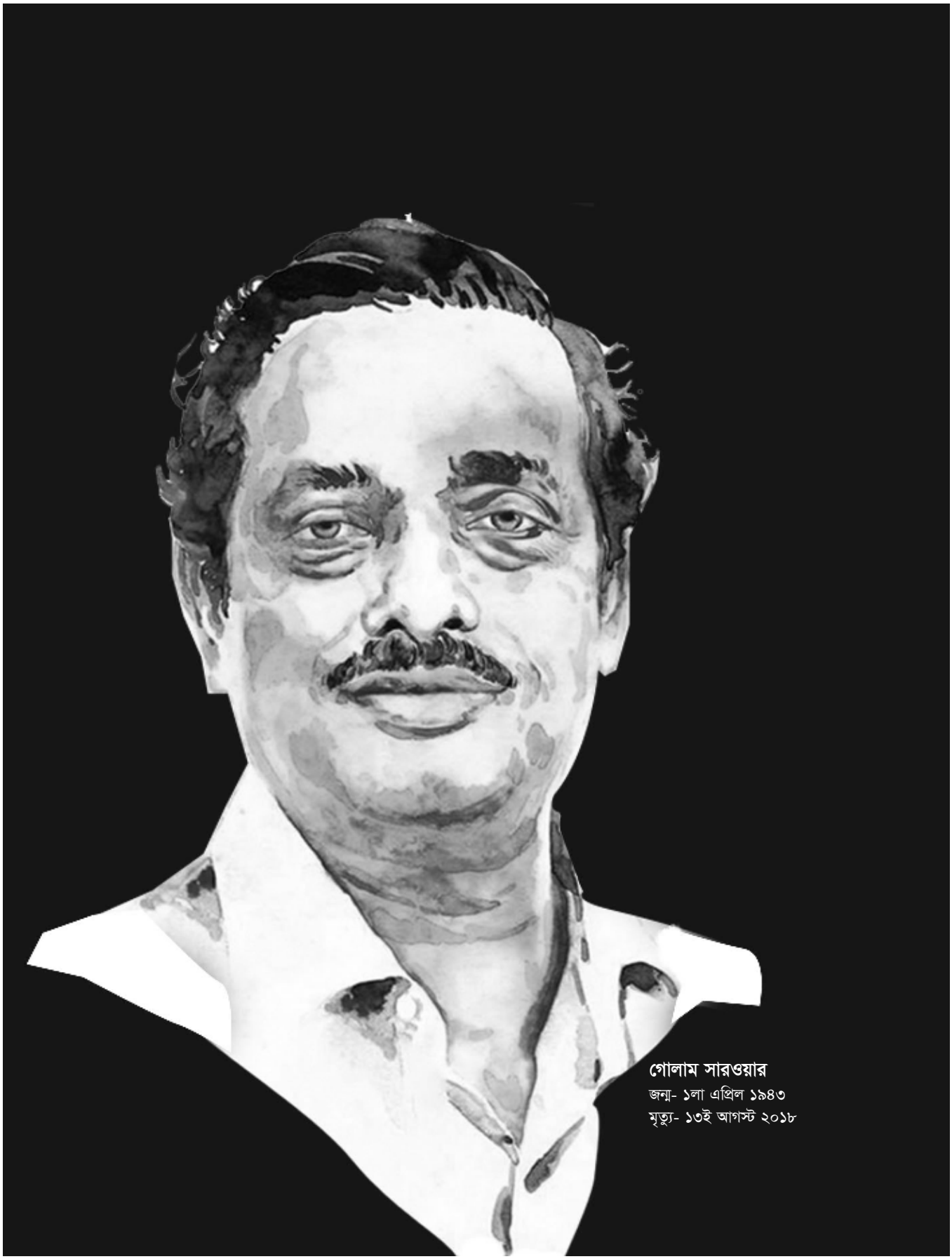

গোলাম সারওয়ার
জন্ম- ১লা এপ্রিল ১৯৪৩
মৃত্যু- ১৩ই আগস্ট ২০১৮

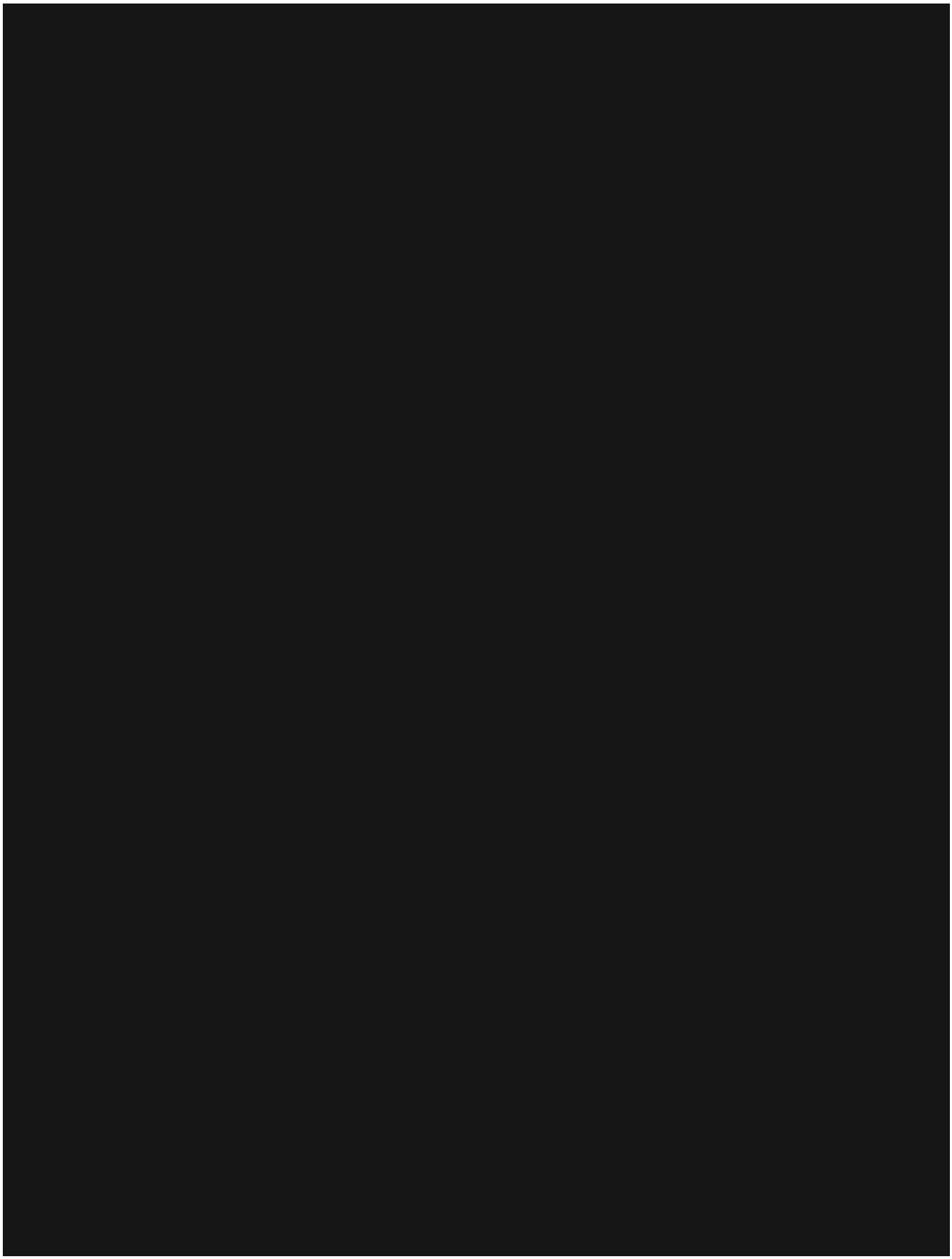

সমকালীন বাংলা সাংবাদিকতার একজন শ্রেষ্ঠ সম্পাদক

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

সদ্য প্রয়াত কোনো মানুষকে নিয়ে স্মরণকথা লেখা বড়োই কষ্টের। আর যদি মানুষটি হন খুবই কাছের, তাহলে সেই কষ্টের কোনো সীমা নেই। ১৩ আগস্ট লন্ডনে বসে যখন শুনলাম গোলাম সারওয়ার আর নেই, তখন মনের আর কোনো অনুভূতিই কাজ করেনি। শোকে অভিভূত হয়েছিলাম– এ কথা বলব না। শোক-দুঃখ সবকিছুর ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছিলাম। আবার যখন অনুভূতি ফিরে এসেছে, তখন বুকের মধ্যে একটা কথাই গুমরে উঠেছে, সারওয়ারকে আর দেখব না। আমার চেয়ে দশ বছরের ছোট গোলাম সারওয়ার আমার আগে চলে যাবেন– এটা ভাবা বড়ো কষ্টকর।

তবু এই জগতের নিয়ম, অনুজকেও চলে যেতে দিতে হয়। এবার যে ঢাকায় গেলাম, গোলাম সারওয়ারের সঙ্গে দেখা হয়নি। লন্ডনে ফিরে এসে কাগজে দেখলাম, সিঙ্গাপুরে গোলাম সারওয়ারের চিকিৎসা হচ্ছে। তখনই ঢাকায় তাঁর সঙ্গে দেখা না হওয়ার কারণ বুঝতে পেরেছি এবং মনের মধ্যে এই আশঙ্কাটা গুমরে উঠেছে, হয়তো তিনি আর ভালো হয়ে ঢাকায় ফিরবেন না। তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের ধকল সামলে উঠছিলেন অনেক আগেই। তবে ছিল আরও অনেক জটিলতা। মাঝেমধ্যে চিকিৎসার জন্য আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলেস যেতেন। সেখানে তাঁর জামাই হাবিব থাকতেন। মেয়ে-জামাইয়ের বাসায় গিয়ে বেড়ানো হতো এবং চিকিৎসাও চলত।

মাঝেমধ্যে টেলিফোনে তাঁর রোগের কথা জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'এগুলো কি আর ভালো হয় ভাই? তবে ভালো চিকিৎসা পাচ্ছি, কিছুদিন হয়তো বেঁচে থাকব।' কোনো রোগকে তিনি আমল দেননি। অনলস তাঁর পত্রিকা সম্পাদনার কাজটি করতেন। আমি একবার দৈনিক সমকালে তাঁর সহযোগী অজয় দাশগুপ্তকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই রোগগ্রস্ত শরীরে সারওয়ার কি রোজ অফিসে আসতে পারেন? সম্পাদনার দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে পারেন?

অজয় দাশগুপ্ত বলেছেন, 'আপনি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না, তিনি অসুস্থ শরীরে রোজ অফিসে আসেন তো বটেই। তার ওপর সুস্থ থাকলে যতটুকু খাটতেন, তার থেকে বেশি খাটেন।' তাঁর কথা আমি বিশ্বাস করেছি। এ রকম আরেকজন মানুষ ছিলেন শহিদ জননী জাহানারা ইমাম। তিনিও আমার কাছের মানুষ। দেখেছি, ক্যান্সার রোগের শেষ পর্যায়েও তিনি রোগ-যন্ত্রণা উপেক্ষা করে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। শোভাযাত্রায় নেমে বিএনপি সরকারের পুলিশের লাঠির আঘাত সহ্য করেছেন।

জীবনের শেষ সময়ে তিনি সমকাল সম্পাদক হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। এই পরিচিতি তো তাঁর আছেই। আসলে তিনি ছিলেন সমসাময়িককালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি সম্পাদকদের একজন। সেই সঙ্গে সম্পাদক-শিক্ষকও বলা চলে। তাঁর কাছে যারা সাংবাদিকতায় শিক্ষা ও দীক্ষা নিয়েছেন, তারা অনেকেই এখন এই পেশার শীর্ষাসনে বসে আছেন

লন্ডন থেকে যখনই ঢাকায় গেছি, গোলাম সারওয়ার যে পত্রিকাতেই থাকুন, আমার কাছে ছুটে এসেছেন। তাঁকে নামে চিনতাম, ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে ১৯৯৯ সালে দৈনিক যুগান্তর প্রকাশের সময়। তিনি যে কেন আমাকে এত শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন, তা আমি জানি না। আমি ঢাকায় গেলেই তিনি আসতেন, বলতেন, 'আমার সঙ্গে একবেলা খেতে হবে।' তাঁর সঙ্গে এই একবেলা খাওয়ার অর্থ, হয় তাঁর পত্রিকা অফিসে, নয় ঢাকা ক্লাবে অথবা কোনো অভিজাত হোটেলে আমার একটি ছোটখাটো সংবর্ধনা।

তাতে ঢাকার বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক এবং মন্ত্রী-আমলারাও আসতেন। ঢাকা ক্লাবে গোলাম সারওয়ার একবার আমার জন্য যে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন, তাতে প্রয়াত কথাশিল্পী হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সেটাই হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে আমার প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ। এরপর তিনিও দুরারোগ্য ক্যান্সারে মারা যান।

১৯৯৯ সালের কথা। আমি তখন শুধু দৈনিক প্রথম আলোতে নিয়মিত কলাম লিখি। হঠাৎ একদিন ইংরেজি সাপ্তাহিক হলিডে কাগজে ছোট একটা বিজ্ঞাপন দেখি। ঢাকা থেকে যুগান্তর নামে নতুন একটি দৈনিক পত্রিকা বের হচ্ছে। আমি নামটা দেখেই লাফিয়ে উঠি। কলকাতায় যুগান্তর নামে একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকা ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক কাগজ। ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি যখন কলকাতায়, তখন এই কাগজে নিয়মিত কলাম লিখতাম।

১৯৯৯ সালে কলকাতার যুগান্তর আর নেই। কিন্তু ঢাকা থেকে একই নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে দেখে খুবই উৎসাহিত হলাম। মনে ইচ্ছা জাগল এই কাগজে লেখার। কিন্তু তাদের কাউকে তো জানি না। কারা কাগজটি বের করছেন, তা-ও জানতে পারিনি। কিন্তু কী বিচিত্র কাকতালীয় ব্যাপার। দুদিন পরেই আমার লন্ডনের বাসায় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলতেই একটি কণ্ঠ জানাল, গাফফার ভাই বলছেন, আমি গোলাম সারওয়ার। যুগান্তর নামে একটি দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছি। আপনাকে আমার কাগজে লিখতেই হবে।

মেঘ না চাইতে জল। আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়েছি। কেবল জিজ্ঞেস করেছি, স্বাধীনভাবে লিখতে পারব তো? সারওয়ার বলেছেন, 'আলবৎ পারবেন। এটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কাগজ হবে।' এর বেশি কিছু শোনার দরকার ছিল না। সারওয়ারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল না। কেবল শুনেছি, তিনি একজন দক্ষ বার্তা সম্পাদক। ইত্তেফাকে ২৭ বছর ধরে বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব সুনামের সঙ্গে পালন করেছেন।

যুগান্তরে লেখা শুরু করার আগেই একটি ঘটনা ঘটল। দেশে কী কারণে যেন আমার দশ হাজার টাকার প্রয়োজন হয়েছিল। আমার হাতে তখন টাকা নেই। সংগ্রহ করে পাঠাতে দেরি হবে। উপায়ান্তর না দেখে গোলাম সারওয়ারকে টেলিফোন করলাম। সারওয়ার জিজ্ঞেস করলেন, কত টাকা? বললাম, দশ হাজার টাকা। লেখা শুরু করিনি। এখনই এত টাকা অগ্রিম চাওয়া ঠিক হচ্ছে কি? সারওয়ার বললেন, চিন্তা করবেন না। টাকাটা কাকে দিতে হবে, নাম ও ঠিকানা বলুন, আমি পৌঁছে দেব।

তাঁকে নাম-ঠিকানা দিলাম। দুদিন পরে আমার আত্মীয় রায়েরবাজার থেকে টেলিফোন করে জানালেন, সারওয়ার তাঁর বাসায় গিয়ে দশ হাজার নয়, ৩০ হাজার টাকা দিয়ে এসেছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হয়েছি। যুগান্তর বের হলো, দেখে খুশি হলাম। সম্পাদনায় গোলাম সারওয়ারের দক্ষতা ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ রয়েছে পত্রিকাটিতে।

বাংলা সংবাদপত্র জগতে যুগান্তর যখন একটি প্রতিষ্ঠিত দৈনিক, তখন ২০০৫ সালে গোলাম সারওয়ার আরেকটি বাংলা দৈনিক প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এটি দৈনিক সমকাল। ঢাকায় ষাটের দশকে 'সমকাল' নামে একটি সাহিত্য মাসিক ছিল। সম্পাদনা করতেন কবি, কথাশিল্পী এবং সাংবাদিক সিকান্দার আবু জাফর। পত্রিকাটি ছিল প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের মুখপত্র। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই মাসিক কাগজটি বন্ধ হয়ে যায়। তখনকার তরুণ সাহিত্যিক সমাজের কাছে পত্রিকাটি ছিল খুবই সমাদৃত। গোলাম সারওয়ার এই নামটি তাঁর নতুন দৈনিকের নাম হিসেবে গ্রহণ করায় খুবই খুশি হয়েছি।

তবে একটি ব্যাপারে আমার সংশয় ছিল। বাজারে তখন নিরপেক্ষতার দাবিদার একটি দৈনিকের প্রবল প্রতাপ। তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়িয়ে গোলাম সারওয়ার যুগান্তরকে শুধু প্রতিষ্ঠা দান করেননি, প্রচারে ওই দৈনিকটিকে প্রায় অতিক্রম করতে চলেছিলেন। এখন পাঁচ বছর না যেতেই আরেকটি দৈনিক বের করে তাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত দৈনিকগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড় করাতে পারবেন কি? গোলাম সারওয়ার নতুন কাগজটির সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে দেখালেন, তা তিনি পারেন। গোলাম সারওয়ারের সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য ছিল সাংবাদিকতার সঙ্গে সাহিত্যরসের সংমিশ্রণ। তিনি নিজেও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর লেখা কয়েকটি বইয়ের নাম হলো– 'অমিয় গরল', 'আমার যতো কথা', 'স্বপ্ন বেঁচে থাক', 'সম্পাদকের জবানবন্দি'। শিশুদের জন্য তাঁর ছড়ার বই আছে। গান লিখেও তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর মধ্যে বহুমুখী প্রতিভার ছাপ ছিল। তার ছাপ পড়েছে তাঁর সাংবাদিকতায়। এককালে সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের মধ্যে যে বৈরীভাব ছিল, একসময় তা কেটে গিয়ে যে সংবাদ-সাহিত্য তৈরি হয়, গোলাম সারওয়ারের সাংবাদিকতায় তার উজ্জ্বল প্রকাশ দেখা যায়। অন্যান্য দৈনিকের সঙ্গে সমকালের সাংবাদিকতার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য এখানে।

সমকালের প্রকাশনার সময়েও এই কাগজে লেখার জন্য আমার কাছে ডাক পড়ে। আমি সানন্দে রাজি হই এবং 'কালের আয়নায়' কলামটি লেখা শুরু করি। তখন ভাবতেও পারিনি, এই 'কালের আয়নায়'ই তার অবিচুয়ারি (obituary) আমাকে লিখতে হবে। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর সম্পাদিত দুই কাগজেই তিনি আমাকে স্বাধীনভাবে লেখার সুযোগ দিয়েছিলেন। এমনকি তাঁর নিজের মতামতের বিরুদ্ধে লিখলেও তা ছাপাতে দ্বিধা করতেন না।

ঢাকা যেসব কাগজে আমি লিখি, তারা সবাই আমাকে স্বাধীনভাবে লেখার ও মতপ্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন। কেবল খটমটি লাগত নিরপেক্ষতার দাবিদার কাগজটিতে লেখার সময়। রোজই লেখা পাঠিয়ে আমাকে উদ্বিগ্ন থাকতে হতো, এই বুঝি সম্পাদক অথবা নির্বাহী সম্পাদকের টেলিফোনে নির্দেশ আসে, আপনার লেখার এই অংশটুকু ছাপা যাবে না অথবা অমুকের সমালোচনা করা যাবে না। আমি বিরক্ত হয়ে এই কাগজে লেখা ছেড়ে দেই। এখনও লিখছি না।

এদিক থেকে সম্পাদক হিসেবে গোলাম সারওয়ার ছিলেন এক বিরাট ব্যতিক্রম। যুগান্তরের সম্পাদক থাকাকালে তিনি তাঁর সহকারী সম্পাদক মিজানুর রহমান খানকে (এখন তিনি প্রথম আলোয়) পাঠান অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামালের কাছে তাঁর একটি লেখার জন্য। এই লেখায় বিচারপতি মোস্তফা কামাল একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমকে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক হিসেবে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব কেন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন।

বিচারপতি মোস্তফা কামাল আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু। আমি তাঁর লেখার প্রতিবাদ জানাতে চাই। গোলাম সারওয়ারের সহকারী মিজানুর রহমান খানকে সে কথা জানাতেই তিনি বললেন, গাফফার ভাই, এই লেখাটার ডিকটেশন আমিই বিচারপতির কাছ থেকে নিয়েছি, আমাদের কাগজেই ছেপেছি। এর প্রতিবাদ আমাদের কাগজেই ছাপা কি ঠিক হবে? আমি বললাম, 'তুমি গোলাম সারওয়ারকে জিজ্ঞেস করো। কিছুক্ষণের মধ্যে মিজান জানালেন, সারওয়ার লেখাটা ছাপতে রাজি হয়েছেন।

আমি একটি দীর্ঘ লেখায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উদাহরণ দিয়ে দেখাই, ঘাতক ও দেশদ্রোহী গোলাম আযমকে দেশের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। বিচারপতি মোস্তফা কামাল আমার লেখার জবাব দেন। কিন্তু আমার লেখার বক্তব্য খণ্ডন করার পরিবর্তে শুধু লেখেন, গাফফারের জেনে রাখা উচিত, তিনি যাকে শেলী ভাই বলে পরম শ্রদ্ধেয় বড়ো ভাইয়ের সম্মান দেন, সেই বিচারপতি হাবিবুর রহমান শেলীও গোলাম আযমের মামলায় তিন বিচারকের একজন ছিলেন এবং গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব ফেরত দেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছিলেন।

এই খবরটি আমার জানা ছিল না। জেনে মনে খুব আঘাত পেয়েছিলাম।

জীবনের শেষ সময়ে তিনি সমকাল সম্পাদক হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। এই পরিচিতি তো তাঁর আছেই। আসলে তিনি ছিলেন সমসাময়িককালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি সম্পাদকদের একজন। সেই সঙ্গে সম্পাদক-শিক্ষকও বলা চলে। তাঁর কাছে যারা সাংবাদিকতায় শিক্ষা ও দীক্ষা নিয়েছেন, তারা অনেকেই এখন এই পেশার শীর্ষাসনে বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে আমার টেলিফোনে প্রায়ই কথা হতো। শেষ কবে কথা হয়েছে, মনে নেই। গত জুলাইয়ে ঢাকায় গিয়েছিলাম। এবার তাঁর দেখা পাইনি। গুরুতর অসুস্থ ছিলেন। আমার ছোট ভাইয়ের মতো খোন্দকার রাশেদুল হক (সবার কাছে নবা ভাই হিসেবে পরিচিত) ঢাকা ক্লাবে আমার জন্য একটি নৈশ ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিই এসেছেন। গোলাম সারওয়ার আসতে পারেননি শারীরিক কারণে। নবাকে তিনি বলেছেন, 'আমার হয়ে গাফফার ভাইয়ের কাছে তুমি ক্ষমা চেয়ো। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আসতে পারলাম না। তাঁর সঙ্গে এ জীবনে আমার আর দেখা হলো না।'

তাঁর কথাই সত্য হলো। সমকালের বাংলা সাংবাদিকতার একজন শ্রেষ্ঠ সম্পাদক অমরলোকে চলে গেলেন।

লন্ডন, ১৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার, ২০১৮
লেখক: বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট
সূত্র: ১৮ আগস্ট ২০১৮, দৈনিক সমকাল

সাংবাদিক জগতে আলোকবর্তিকা

হাসান শাহরিয়ার

গত জুন থেকে আমার গোটাকয়েক আপনজনের মৃত্যুতে আমি অনেকটা বিপর্যস্ত। প্রথমেই হারালাম আমার আদরের ছোট বোন আসমা হোমায়েরা চৌধুরী বেবীকে। তারপর চিরবিদায় নিলেন আমার স্বজন ও বন্ধুবর কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (সিজেএ) প্রতিষ্ঠাতা ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেরেক ইনগ্রাম, আমার এক ভাইপো অ্যাডভোকেট আজিজুল ইসলাম চৌধুরী, ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবিএম সাখাওয়াত উল্লাহর স্ত্রী এবং ইংরেজি দৈনিক ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন। তাঁদের শোক ভুলতে না ভুলতেই আমার দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও অকৃত্রিম বন্ধু দৈনিক 'সমকাল' সম্পাদক গোলাম সারওয়ার পাড়ি জমালেন না-ফেরার দেশে। একে একে সব দেউটি নিভে যাচ্ছে আর 'শ্রাবণের শেষাশেষি নিরাক পড়েছে'; নিস্তেজ দীপবর্তিকাগুলোর চারপাশে বিরাজ করছে নিবিড় অন্ধকার ও নিঃসীমতা। ১৩ আগস্ট সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গোলাম সারওয়ার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বন্ধু আশরাফ আহমেদ ও আমি তাঁকে দেখতে যাই ৬ আগস্ট। ওই দিনই তাঁর একমাত্র মেয়ে রত্না আমেরিকা থেকে সিঙ্গাপুর এসে পৌঁছে। অবশ্য তাঁর স্ত্রী, দুই ছেলে রঞ্জু ও অঞ্জু এবং জামাতা হাবিব ঢাকা থেকেই তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন। তিনি হাসপাতালের সিসিইউতে থাকায় কাছে যেতে পারিনি। কক্ষের বাইরে নীরবে দাঁড়িয়ে শেষ দেখা দেখেছিলাম। দোয়া করেছিলাম, আল্লাহতায়ালা যেন তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। ঢাকা ফিরে এসে প্রতিদিনই ফোনে তাঁর স্বাস্থ্যের খবর নিয়েছি। এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে তাঁকে সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়ার আগে ঢাকার ল্যাবএইড হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়। কারণ স্ট্রোক হওয়ার পর আমার ছোট বোন বেবী ল্যাবএইড হাসপাতালে থাকা অবস্থায় নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়। পরে গত ৬ জুন সে মারা যায়। আমার বোনটি গোলাম সারওয়ারের অন্ধ ভক্ত ছিল। গোলাম সারওয়ারও তাঁকে স্নেহ করতেন। তাই তাঁর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আমার সেগুনবাগিচার অ্যাপার্টমেন্টে ছুটে এসেছিলেন। গোলাম সারওয়ারেরও নিউমোনিয়া হয়েছিল বলে আমি কিছুটা শঙ্কিত ছিলাম।

মনে পড়ে, ১৯৯৪ সালে গোলাম সারওয়ারকে কলকাতা নিয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। সেখানে তাঁর স্ত্রী, মেয়ে রত্না ও আমি এক মাস ছিলাম। আমেরিকায় সুচিকিৎসার ফলে তিনি ক্যান্সার-

দীর্ঘদিনের সহকর্মী ও অকৃত্রিম বন্ধু দৈনিক 'সমকাল' সম্পাদক গোলাম সারওয়ার পাড়ি জমালেন না-ফেরার দেশে। একে একে সব দেউটি নিভে যাচ্ছে আর 'শ্রাবণের শেষাশেষি নিরাক পড়েছে'; ... ১৩ আগস্ট সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গোলাম সারওয়ার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন

মুক্ত হয়েছিলেন। তখন তিনি পবিত্র হজব্রতও পালন করেন। ভেবেছিলাম, এবারও বোধ করি আগের মতোই তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী হবেন; কিন্তু হৃদরোগ, ফুসফুসে পানি ও নিউমোনিয়া তাঁর দেহের অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অসাড় করে দেওয়ায় চিকিৎসাশাস্ত্র অচল হয়ে গেল।

গোলাম সারওয়ার দৈনিক 'সংবাদ' থেকে দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এ যোগ দিয়েছিলেন বার্তাকক্ষের শিফট-ইনচার্জ পদে। অসাধারণ কর্মদক্ষতার জন্য দীর্ঘ ২৭ বছরে ধাপে ধাপে তাঁর উন্নতি হয়– চিফ সাব-এডিটর, যুগ্ম বার্তা সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদক হিসেবে। কিছু দিন ইত্তেফাক গ্রুপের সিনে-সাপ্তাহিক 'পূর্বাণী'র নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ছিলেন দৈনিক 'যুগান্তর' ও দৈনিক 'সমকাল' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত তিনি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-পিআইবির চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ছিলেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহসভাপতি ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (সিজেএ) একজন প্রবীণ সদস্য ছিলেন।

মুরব্বিরা বলেন, সহকর্মী কখনো সত্যিকারের বন্ধু হয় না। সামান্য স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলেই সহকর্মী বন্ধুটি হয়ে যান পরম শত্রু। এমন দৃষ্টান্ত অঢেল। একসঙ্গে কাজ বা ওঠাবসা করলে অনেক ঘটনাই ঘটে। সবসময় যে তা প্রীতিকর হয়, তা নয়। বন্ধুর কাছ থেকে হয়তো অনেক উপকার পেয়েছেন; কিন্তু সামান্য ঘটনায় তা তুচ্ছ হয়ে যায়। নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে তিনি বিভিন্ন লোকের কাছে গিয়ে তার বদনাম করেন, কর্মক্ষেত্রে গ্রুপিং করেন; পদে পদে তাকে হেয়প্রতিপন্ন করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। কিন্তু সাংবাদিক-সম্পাদক গোলাম সারওয়ার ছিলেন তার এক অনন্য ব্যতিক্রম। কোনো সহকর্মীর সঙ্গে তাঁর যতই খারাপ সম্পর্ক থাকুক না কেন, জনে জনে গিয়ে তিনি তার কুৎসা রটনা বা বদনাম করেছেন– এমন অপবাদ তাঁর শত্রুও বোধ করি বলার দুঃসাহস দেখাবে না। অত্যন্ত মহৎ হৃদয়, অপূর্ব জ্ঞানভাণ্ডার, সদাচারনিষ্ঠ, সত্যিকারের পেশাদারিত্ব কিংবা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী লোকের পক্ষেই এমনটি হওয়া সম্ভব। গোলাম সারওয়ারের চরিত্রে এই গুণগুলোর এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটায় তিনি ছিলেন সর্বমহলে সমাদৃত। পেশার মান উন্নত রেখে এবং পেশাদারিত্বকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়ায় চরম সহিষ্ণু, পরিশ্রমী, অসাম্প্রদায়িক ও অকুতোভয় গোলাম সারওয়ার ছিলেন এ দেশের সাংবাদিকতার অন্যতম শিরোমণি।

দীর্ঘদিন সহকর্মী থাকার পরও আমি গোলাম সারওয়ারকে পেয়েছি খাঁটি বন্ধু ও নিঃস্বার্থ সুহৃদ হিসেবে। কর্মক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে যে স্বার্থের সংঘাত ঘটেনি, তা হলফ করে বলতে পারব না। কিন্তু আমরা ওই বিষয়টিকে সবসময় গৌণ করে দেখেছি; প্রাধান্য দিয়েছি বন্ধুত্বের, ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের। তাঁর বাড়ি বরিশাল, আমার বাড়ি বৃহত্তর সিলেটের সুনামগঞ্জে। কোনো রক্তের সম্পর্ক নেই; কিন্তু আমাদের সম্পর্ক লৌকিক আত্মীয়তার অনেক ঊর্ধ্বে। আমার জীবন ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে প্রকাশিত 'হাসান শাহরিয়ার: সাংবাদিকতায় জীবন্ত কিংবদন্তি' পুস্তকে 'এক প্রচারবিমুখ মেধাবী সাংবাদিক' শীর্ষক এক নিবন্ধে গোলাম সারওয়ার লিখেছেন, "অনেকে জানেন না হাসান শাহরিয়ারের সঙ্গে আমার শুধু ঘনিষ্ঠ পেশাগত সম্পর্ক নয়, তিনি আমাদের পরিবারের সদস্যের মতোই একজন। আমার একমাত্র মেয়ে রত্না, দুই ছেলে রঞ্জু ও অঞ্জু 'শাহরিয়ার আঙ্কেল' বলতে প্রায় অজ্ঞান। ওরা সবাই যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী। আমেরিকা যাওয়ার আগে ওরা বলত– 'শাহরিয়ার আঙ্কেল'কে কিন্তু আনবে। সব সময় সম্ভব হতো না। মাঝেমধ্যে আমরা দুজন একসঙ্গে লস অ্যাঞ্জেলেস গিয়েছি। আমার ছেলেমেয়েরা এবং একমাত্র জামাতা হাবিব আমাকে নয়, 'শাহরিয়ার আঙ্কেল'কে নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়ত।"

গোলাম সারওয়ার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে যাওয়ার আগের দিনও আমরা একসঙ্গে আড্ডা দিয়েছি। আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, আমাদের চার দশকেরও বেশি বন্ধুত্বে কখনো ফাটল ধরেনি, বরাবরই এক রকম ছিল। অবিভক্ত পাকিস্তানে আমি করাচি থেকে প্রকাশিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দৈনিক 'ডন'-এ রিপোর্টার হিসেবে কর্মরত ছিলাম। পাশাপাশি ঢাকার দৈনিক ইত্তেফাক-এর পশ্চিম পাকিস্তান সংবাদদাতা। ১৯৬৯ সালে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার মৃত্যুর পর পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাঁর বড়ো ছেলে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন। বার্তা সম্পাদক শহিদ সিরাজুদ্দীন হোসেনের সুপারিশে তিনি আমাকে চিফ রিপোর্টার হিসেবে নিয়োগ দেন। আমি মইনুল হোসেনের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করি। আমি ১৯৭১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পিআইএ'র ঢাকা ফ্লাইটের টিকিট ক্রয় করি। কথায় বলে– ম্যান প্রোপজেজ, গড ডিসপোজেজ। অর্থাৎ মানুষ ভাবে একটি, আল্লাহ করেন আরেকটি।

প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে 'বিদ্রোহী' বাঙালিদের দমন করা বা 'সমুচিত শিক্ষা' প্রদানের উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গোপনে পিআইএ'র নিয়মিত ফ্লাইটে সাদা পোশাকধারী সৈন্য ও মিলিশিয়া ঢাকায় পাঠাতে শুরু করল ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে। ফলে আমার বহু প্রতীক্ষিত ফ্লাইট বাতিল হয়ে গেল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো সম্পাদিত সিমলা চুক্তির আওতায় ঢাকায় আমার আসা হলো ঠিকই; কিন্তু রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালির বিজয় ও নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর। তা-ও আবার আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মাধ্যমে, পাকিস্তানি-বাঙালি বিনিময়ের আওতায়। মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে না পারার বেদনায় আমি এখনো ব্যথিত।

আমি যখন কলেজের ছাত্র, তখনই সম্পৃক্ত হই দৈনিক ইত্তেফাক-এর সঙ্গে। এর পর টানা ৪৫ বছর। এই ঐতিহ্যবাহী পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও অকুতোভয় সম্পাদক মরহুম তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া, তাঁর দুই ছেলে ও নাতি-নাতনিদের অর্থাৎ তিন পুরুষের সঙ্গে অত্যন্ত আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। করাচি থেকে ফিরে আমি বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে ইত্তেফাক-এ যোগ দিলাম ১৯৭৪ সালের ১ জানুয়ারি। প্রথম দিন থেকেই গোলাম সারওয়ারের সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে। ইত্তেফাক-এর দিনগুলো ছিল আমাদের জীবনের সোনালি অধ্যায়ের অংশবিশেষ। আমাদের দুজনের প্রতি ইত্তেফাক-এর কর্ণধারদের ছিল অবিচল আস্থা ও অগাধ বিশ্বাস।

তখনকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রভাবশালী পত্রিকা ইত্তেফাককে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল আমাদের সাংবাদিক জীবন। গোলাম সারওয়ার লিখেছেন, "বয়সে তরুণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এই 'মানিকজোড়'কে খুব পছন্দ করতেন। দৈনন্দিনের সম্পাদকীয় বৈঠক ছাড়াও ইত্তেফাক নিয়ে তাঁর নানা স্বপ্ন ও ভাবনা নিয়ে আমাদের সঙ্গে মতবিনিময় করতেন। তাঁর স্বপ্ন রূপায়ণে যাঁদের ওপর নিশ্চিন্তে ভরসা করতেন, তাঁদের মধ্যে ছিলাম আমি ও হাসান শাহরিয়ার। একদা ইত্তেফাক অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও দুর্যোগের কবলে পড়েছিল। হত্যাকাণ্ডের মতো মর্মান্তিক ঘটনাও ঘটেছিল ইত্তেফাক ভবনে। এই ভয়ংকর দুঃসময়ে আমি, হাসান শাহরিয়ার, প্রয়াত হাবিবুর রহমান মিলন, সংবাদপত্র প্রেস শ্রমিক নেতা প্রয়াত ফজলে ইমাম আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর পাশে ছিলাম। এই দুঃসহ দিনগুলো স্মরণের বালুকাবেলায় এখনো মাঝে মাঝে উঁকি দেয়।" (হাসান শাহরিয়ার: সাংবাদিকতায় জীবন্ত কিংবদন্তি)।

গোলাম সারওয়ারের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। আমরা একসঙ্গে দেশে-বিদেশে ভ্রমণ করেছি এবং একই শয্যায় ভাগাভাগি করে শুয়েছি। আমার তীব্র নাসিকা গর্জন হয়তো তাঁর ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে; কিন্তু কোনোদিন তিনি তা প্রকাশ করেননি। এ দেশের সাংবাদিক জগতে তিনি ছিলেন এক আলোকবর্তিকা, তরুণ সাংবাদিকদের কাছে শিক্ষক সমতুল্য। তাঁর শূন্য আসন সহসা পূরণ হবে না। আমি ভাগ্যবান যে, আমার কর্মক্ষেত্রে গোলাম সারওয়ারের মতো একজন বন্ধু পেয়েছিলাম।

বন্ধুবর গোলাম সারওয়ার, আল্লাহ যেন আপনাকে জান্নাতবাসী করেন। যতদিন বেঁচে থাকব, আপনার ছবি আমার মানসপটে ভাসবে; মনে পড়বে ফেলে আসা সোনাঝরা দিনগুলোর কথা। আমার স্মৃতিতে আপনার স্থান হবে শীর্ষে। কবির কথা দিয়েই আমার লেখার ইতি টানছি:

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।'

লেখক: প্রবীণ সাংবাদিক, কলাম লেখক ও বিশ্লেষক এবং কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (সিজেএ) ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমেরিটাস

সূত্র: ১৬ আগস্ট ২০১৮, দৈনিক সমকাল

আধুনিক সাংবাদিকতার পথিকৃৎ

ড. গোলাম রহমান

দৈনিক সমকাল ও যুগান্তরের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক গোলাম সারওয়ারের মৃত্যুসংবাদ সোমবার রাতে যখন পাই, তখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না। এটা ঠিক, তিনি ৭৫-এ পা দিয়েছিলেন, তাঁর সাংবাদিকতার বয়সই সাড়ে পাঁচ দশক পেরিয়েছে; কিন্তু তাঁর এই মৃত্যুকে 'অকাল' বলতে আমার দ্বিধা নেই। কারণ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁকে সংবাদকক্ষে সক্রিয় দেখা গেছে। তাঁর মেধা, অভিজ্ঞতা ও আদর্শ থেকে আমাদের আরো অনেক কিছু পাওয়ার ছিল। সবাই জানেন, গোলাম সারওয়ার আমাদের দেশের একজন কৃতী, গুণী সাংবাদিক ও সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু তিনি আর দশজন কৃতী সাংবাদিক থেকে কতটা স্বতন্ত্র, তাঁকে কাছ থেকে দেখলে বোঝা যেত। গোলাম সারওয়ার যখন সম্পাদক হননি, দেশের অন্যতম প্রাচীন সংবাদপত্র দৈনিক ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক হিসেবে কাজ করতেন, তখনই তাঁর কর্মদক্ষতা ও মেধার খবর সাংবাদিকতা জগতের সবাই জানতেন। তাঁকে বলা হতো বার্তা সম্পাদকদের বার্তা সম্পাদক। অন্যান্য পত্রিকার বার্তা সম্পাদকরাও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিতেন। তিনি ছিলেন সাংবাদিকতা জগতে সবার প্রিয় 'সারওয়ার ভাই'। তিনি ইত্তেফাকে বার্তা সম্পাদক থাকাকালেই তাঁর সম্পর্কে জানতাম। আমরা সাংবাদিকতার ক্লাসে বার্তা সম্পাদক প্রসঙ্গে তাঁর উদাহরণ তুলে ধরতাম। কিন্তু সিনেমা সেন্সর বোর্ডের আপিল বিভাগে যোগ দেওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগতভাবে সখ্য ছিল না। ওই বোর্ডে একসঙ্গে কাজ করার সময় তাঁর মেধা ও মনন, বিবেচনা ও বিচক্ষণতা দেখার সুযোগ হয়েছে আমার।

বাংলাদেশের সাংবাদিকতা জগতে একটি ধারা প্রচলিত রয়েছে। যাঁরা সাংবাদিক নেতা হিসেবে বেশি সক্রিয় থাকেন, তাঁরা ব্যবহারিক সাংবাদিকতায় ততটা সময় দিতে পারেন না। কিন্তু গোলাম সারওয়ার যেন ছিলেন সব্যসাচী। তিনি একদিকে যেমন বার্তাকক্ষের খুঁটিনাটি থেকে নীতিনির্ধারণ করেছেন, তেমনই সাংবাদিক সংগঠনগুলোয়ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রেস ক্লাবে তিনি ছিলেন এক প্রিয়মুখ। সারওয়ার ভাইয়ের রাজনীতি সচেতনতা ছিল লক্ষণীয়। তিনি সাংবাদিকতা করার সময়ই দেশে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হলে সাংবাদিকতা ছেড়ে রণাঙ্গনে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। স্বাধীনতার পর ফিরে এসে অস্ত্র রেখে ফের কলম ধরেছেন। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে সোচ্চার ছিলেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

বস্তুত গোলাম সারওয়ার নিজেই বাংলাদেশের আধুনিক সাংবাদিকতার পথিকৃৎ। তিনি নিজেই আমাদের সাংবাদিকতা জগতে খেলার রঙিন পাতা, আলাদা ঈদ সংখ্যার মতো বিষয়গুলো যোগ করেছেন। সাংবাদিকতায় নতুন 'ট্রেন্ড' চালু করার বিষয়টি তিনি সবসময়ই যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন

ইত্তেফাকের মতো পত্রিকায় আড়াই দশকের ক্যারিয়ার ছেড়ে তিনি যখন যুগান্তর প্রতিষ্ঠান করতে আসেন, সিদ্ধান্তটি সহজ ছিল না। কারণ নতুন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ অনেক। কিন্তু শুধু যুগান্তরকে পাঠকপ্রিয় করেই ক্ষান্ত হননি, প্রতিষ্ঠা করেছেন আরেকটি দৈনিক সংবাদপত্র 'সমকাল'। একজীবনে দুটি সফল সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হওয়ার সৌভাগ্য কতজনের রয়েছে, আমার জানা নেই।

সংবাদপত্রের জগতে সমকাল এক নতুন ধারা নিয়ে এসেছিল। পত্রিকাটি দেখে বোঝা যেত, এখানে একজন কুশলী সম্পাদকের স্পর্শ রয়েছে। তিনি সমকালকে একটি প্রগতিশীল ও অসাম্প্রদায়িক পত্রিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠায় যে ভূমিকা রেখেছেন, বাংলাদেশের সাংবাদিকতা জগতে তা অম্লান হয়ে থাকবে। সমকাল বা যুগান্তরের বাইরেও অম্লান হয়ে থাকবে গোলাম সারওয়ারের ভূমিকা।

এই লেখা লিখতে গিয়ে মনে পড়ছে, সর্বশেষ ২০১৬ সালে বরিশালের বানারীপাড়ায় গিয়েছিলাম প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে। সেখানে একটি জনঅবহিতকরণ ও প্রশিক্ষণ সভায় যোগ দিয়েছিলাম। তখন স্থানীয় সাংবাদিকদের উদ্যোগে তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়। আমি জানতাম, তিনি বরিশাল অঞ্চলের মানুষ; কিন্তু তাঁর বাড়ি যে বানারীপাড়ায়, সেটা জানতাম না। সারওয়ার ভাই আমাকে ফোনে বললেন, আপনি সাংবাদিকতার শিক্ষক। বানারীপাড়ার সাংবাদিকরা যাতে 'আধুনিক সাংবাদিকতা' করতে পারে, সেই প্রশিক্ষণ দিন।

বস্তুত গোলাম সারওয়ার নিজেই বাংলাদেশের আধুনিক সাংবাদিকতার পথিকৃৎ। তিনি নিজেই আমাদের সাংবাদিকতা জগতে খেলার রঙিন পাতা, আলাদা ঈদ সংখ্যার মতো বিষয়গুলো যোগ করেছেন। সাংবাদিকতায় নতুন 'ট্রেন্ড' চালু করার বিষয়টি তিনি সবসময়ই যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। এই স্বল্প পরিসরে ও প্রায় তাৎক্ষণিক লেখায় গোলাম সারওয়ার সম্পর্কে বিস্তারিত বলার অবকাশ নেই। আমি বিশ্বাস করি, আগামী দিনগুলোয় তাঁর চিন্তা, চর্চা ও দূরদর্শিতা সম্পর্কে আমরা আরো নতুন নতুন তথ্য জানতে পারব। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম জগতে গোলাম সারওয়ার হয়ে থাকবেন এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

সন্দেহ নেই, সাংবাদিকতায় সারওয়ার ভাইয়ের শূন্যতা পূরণ করা কঠিন। খুব সহজে আরেকজন গোলাম সারওয়ার তৈরি হবেন না। কিন্তু আমি জানি, তিনি অনেক সাংবাদিক তৈরি করেছেন। আমি আশা করি, তাদের মধ্য থেকে কেউ না কেউ বেরিয়ে আসবেন। অনাগত প্রজন্মের কাছে বয়ে নিয়ে যাবেন আধুনিক ও মুক্ত সাংবাদিকতার মশাল।

লেখক: সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার, সাবেক অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূত্র: ১৫ আগস্ট ২০১৮, দৈনিক সমকাল

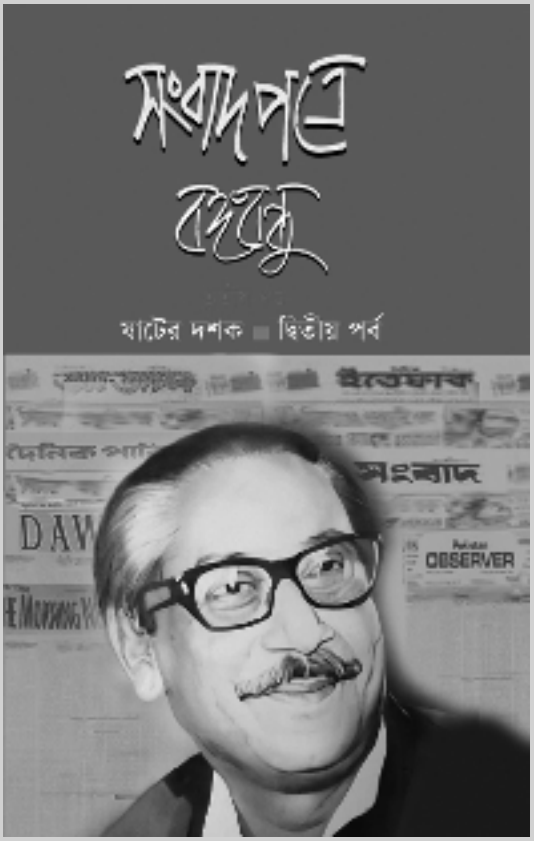

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

একজন গোলাম সারওয়ার

শামীমা চৌধুরী

জীবনালেখ্য পর্ব

এ দেশের আধুনিক বস্তুনিষ্ঠ, সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিকতা ইতিহাসের অন্যতম মহানায়ক মুক্তিযোদ্ধা গোলাম সারওয়ার। অর্ধশতক ধরে যে ক'জন প্রথিতযশা সাংবাদিক এ দেশের সংবাদপত্রশিল্পকে মেধা, শ্রম, দক্ষতা দিয়ে টিকিয়ে রেখেছেন এবং এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলেছেন, তাঁদের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি গোলাম সারওয়ার। এদেশের সংবাদপত্রশিল্প-সাংবাদিকতা পেশা আর গোলাম সারওয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সাংবাদিক গোলাম সারওয়ারকে জানতে হলে ফিরে তাকাতে হয় তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা আর ঘটনাবহুল জীবনের দিকে। ১৯৪৩ সালের ১ এপ্রিল দেশের দক্ষিণ জনপদ বরিশালের বানারীপাড়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা গোলাম কুদ্দুস মোল্লা, মা সিতারা বেগম। ছয় ভাই-বোনের মধ্যে সবার বড়ো তিনি। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু বানারীপাড়া স্কুলে। তবে মাঝখানে ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণি– এ দুই বছর ঢাকার আজিমপুরের ওয়েস্ট অ্যান্ড হাইস্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন। ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন বরিশালে চাখার শেরেবাংলা কলেজ থেকে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্সসহ এমএ পাস করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি বাঙালির অধিকার আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের অনুসারী ছিলেন তিনি।

শিশুকাল থেকেই তাঁর লেখার সঙ্গে সখ্য। স্কুলের দেয়াল পত্রিকায়, কলেজের ম্যাগাজিনে ছাপা হতো তাঁর ছড়া, গল্প, কবিতা। দৈনিক আজাদের শিশুপাতা, সাহিত্য পাতায় লিখতেন। এভাবেই একদিন লেখার অভ্যাসই হয়ে উঠে তাঁর পেশা। তিনি বিভিন্ন শিশু সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। খেলাঘর ছিল তাঁর প্রিয় সংগঠন।

ষাটের দশকে ছেলেবেলার বন্ধু সৈয়দ মোস্তফা জামালের সঙ্গে সৈনিক পত্রিকায় যাতায়াতের মধ্য দিয়ে সাংবদিকতার প্রতি তাঁর অনুরাগ সৃষ্টি হয়। ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন দৈনিক আজাদীর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা হিসেবে তাঁর সাংবাদিক জীবনের শুরু। পত্রিকা থেকে বেতন পেতেন না ঠিকমতো। পিতার ওপর চাপ দিতে চাইতেন না। তাই চিন্তাধারায় না মিললেও বাধ্য হয়ে দৈনিক পয়গামে কাজ করেন কিছুদিন। গোলাম সারওয়ারের মেধায় আকৃষ্ট হয়ে

6

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের দিন আমি হেডিং করেছিলাম– 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ব্যস, আর যাই কোথায়! ... হলোও তাই। আমার মতো করে 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই হেডিং ব্যানার করে ৮ মার্চ সংবাদ প্রকাশিত হলো

9

প্রখ্যাত সাংবাদিক, লেখক শহীদুল্লা কায়সার তাঁকে সংবাদে সহসম্পাদক পদে চাকরি দেন। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তিনি এখানে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বেজে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের দামামা। তরুণ সারওয়ার যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। ৯ নম্বর সেক্টরে তিনি যুদ্ধ করেন। বানারীপাড়া থানা আক্রমণ ও পতনের অন্যতম নায়ক ছিলেন তিনি।

স্বাধীনতার পর কিছুদিন স্থানীয় লোকজনের অনুরোধে বানারীপাড়া ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭২ সালে ফিরে আসেন তাঁর মূল পেশায়। সিনিয়র সহসম্পাদক হিসেবে যোগ দেন দৈনিক ইত্তেফাকে। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত তিনি এই পত্রিকার যথাক্রমে প্রধান সহসম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে পত্রিকাটি প্রকাশনায় শীর্ষে উঠে যায়। ব্যাপক চাহিদার কারণে পত্রিকাটি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতো। তিনি এদেশের সংবাদপত্রে প্রথম দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথা প্রবর্তন করেন। শিরোনামে আনেন বৈচিত্র্য। পত্রিকাটির খেলাধুলার পাতা, অন্যান্য সংবাদভিত্তিক ফিচার পাতার পাঠকপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষণীয়। দীর্ঘ ২৭ বছর তিনি ইত্তেফাকের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পেশার পাশাপাশি সাংবাদিক, প্রেস শ্রমিকদের প্রতিটি দাবি ও আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি।

তিনি এদেশের সাংস্কৃতিক ও সিনে সাংবাদিকতার অন্যতম অগ্রদূত। তাঁরই উদ্যোগে ইত্তেফাক গ্রুপ থেকে সাপ্তাহিক পূর্বাণী প্রকাশিত হতো। তিনি ছিলেন এই পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক। এই পত্রিকার মাধ্যমে তিনি টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র সমলোচনার বিষয়টি জনপ্রিয় করে তোলেন। তাঁরই উদ্যোগে ও সম্পাদনায় বৃহৎ কলেবরে পূর্বাণীর ঈদ সংখ্যা প্রকাশিত হতো, যা এর আগে হয়নি। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে বাংলা সংস্কৃতির বিকাশে তাঁর আপসহীন ভূমিকা প্রশংসার দাবিদার।

১৯৯৯ সালে গোলাম সারওয়ার দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক পদে যোগ দেন। পত্রিকার ভাষায়, ট্রিটমেন্টে আনেন নতুনত্ব। এই পত্রিকাটিকে জনপ্রিয় করতে তিনি ঘুরেছেন প্রত্যন্ত জনপদে। ২০০৫ সালে দৈনিক সমকালের সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পত্রিকার ভাষা, শিরোনাম, রিপোর্টিং, ছবির ক্যাপশন– সর্বক্ষেত্রে আনেন বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব।

সম্পাদক পদের মতো গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থেকেও এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সংগঠন-সংস্থার নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক পর্যায়ে তিনি নিরলস কাজ করে গেছেন। তিনি বাংলাদেশ সম্পাদক পরিষদের সভাপতি, সেন্সর বোর্ডের আপিল বিভাগের সদস্য ছিলেন। ছিলেন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের চেয়ারম্যান। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন একাধিকবার। তিনি ছিলেন বানারীপাড়া বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি, উত্তরা হাইস্কুলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। বাসস'র পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি।

তিনি কর্মসূত্রে ভ্রমণ করেছেন বহু দেশ। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, পাকিস্তান, জাপান, ডেনমার্ক, সুইডেন, কানাডাসহ অনেক দেশ রয়েছে এই তালিকায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফরসঙ্গী হিসেবে গেছেন কোপেনহেগেন ও দিল্লি।

সাংবাদিকতা জীবনের শত ব্যস্ততার ভেতরেও লালন করে গেছেন তাঁর লেখকস্বত্তা-সাহিত্যস্বত্তাকে। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে– রঙিন বেলুন, সম্পাদকের জবানবন্দি, অমিয় গরল, আমার যত কথা, স্বপ্ন বেঁচে থাক।

সাংবাদিকতার জন্য তিনি বহু পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেন। ২০১৪ সালে তিনি একুশে পদক লাভ করেন।

স্ত্রী সালেহা সারওয়ার, দুই পুত্র গোলাম শাহরিয়ার রঞ্জন, গোলাম সাব্বির অঞ্জন ও এক কন্যা সুষমা নাইম রত্নাকে নিয়ে ছিল তাঁর একান্ত ব্যক্তিজীবন।

২০১৮'র ১৩ আগস্ট ফুসফুসের জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে সিঙ্গাপুরের জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি এই নশ্বর পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেন। তাঁর ইন্তেকালে এই পেশার অঙ্গনে, দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভুবনে নেমে আসে শোকের ছায়া। সাংবাদিকতার বাতিঘর ছিলেন তিনি। এ দেশের শুদ্ধ, সত্য, স্বচ্ছ সাংবাদিকতায় তাঁর নাম চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হবে।

সাক্ষাৎকার পর্ব

২০১৬ সালের ডিসেম্বর এবং ২০১৭ সালের ২৬ আগস্ট শামীমা চৌধুরীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর ব্যক্তিজীবন, সাংবাদিক জীবন, সিনে সাংবাদিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন, লেখক জীবনের অনেক কথা বলেন। সেই কথাগুলো তুলে ধরা হলো–

প্রশ্ন: সাংবাদিকতা পেশাকে বেছে নেওয়া কেন?

গোলাম সারওয়ার: এই বয়সে এসে আমার মনে হয়, আমি হয়তো অবচেতন মনে সাংবাদিকই হতে চেয়েছিলাম। ১৯৭১ সালের আগে বানারীপাড়া ছিল প্রত্যন্ত জনপদ। সেখানেই আমার জন্ম, বেড়ে ওঠা। কিন্তু কি আশ্চর্য! সেই প্রত্যন্ত জনপদের মানুষ বিশেষ করে আমাদের পরিবারের অনেকেই জানত ভাষা আন্দোলনের কথা। জানত বাঙালির অধিকার নিয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর লড়াইয়ের কথা। বাড়িতে দুদিন পরে খবরের কাগজ আসত– দৈনিক আজাদ, সংবাদ। আমরা হুমড়ি খেয়ে সেই খবরের কাগজ পড়তাম। বাবা বরিশাল গেলে, ঢাকা গেলে বিভিন্ন পত্রিকা নিয়ে আসতেন। বাবার কারণে বাড়িতে একটা পড়াশোনার পরিবেশ ছিল। আমাদের পরিবার এলাকার বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল। আমি ছোটবেলা থেকে ছড়া লিখতাম, গল্প লিখতাম। স্কুলের দেয়াল পত্রিকায় এগুলো প্রকাশ হতো। এই লেখালেখির অভ্যাস আমাকে হয়তো এই জগতে নিয়ে আসে। তাছাড়া ছিলাম মিডিওকার ছাত্র। জজ-ব্যারিস্টার তো হব না। মনে হতো এই লেখাই আমাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে।

যখন ঢাকায় এলাম, তখন দেখি আমার বন্ধু সৈয়দ মোস্তফা জামাল সৈনিক পত্রিকায় কাজ করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে এই পত্রিকাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। আমি মোস্তফার সঙ্গে অফিসে যেতাম, কপি দেখতাম, নিজেও টুকটাক লিখতাম। পত্রিকা তখন ডাকে পাঠানো হতো। কোথায়, কোথায় পত্রিকা যাবে, তার ঠিকানা লিখে প্যাকেটের গায়ে সেঁটে দিতাম। এভাবেই পত্রিকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়া।

১৯৬০ সালের দিকে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক আজাদীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টার হিসেবে কাজ করতে শুরু করি। সামান্য বেতন। বাবাও পুরো টাকা পাঠাতে পারছিলেন না। পড়াশোনা প্রায় বন্ধ হওয়ার পথে। বাধ্য হয়ে পয়গামে চাকরি নিই। মোনেম খানের পত্রিকা। আদর্শের মিল নেই। তবুও চাকরি করা। আগে থেকেই শহীদুল্লা কায়সারের সঙ্গে পরিচয় ছিল। তিনি আমাকে ডেকে ১৫০ টাকা বেতনে সংবাদে চাকরি দেন। সংবাদ থেকে সিরিয়াসলি শুরু হলো আমার সাংবাদিক জীবন।

প্রশ্ন: এ সময়ের কোনো বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়ে?

গোলাম সারওয়ার: ৬ দফার দাবিতে বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন তখন তুঙ্গে। আমি তাঁর আদর্শের একজন সৈনিক। আমি খুব ভালো অনুবাদ করতে পারতাম। সম্পাদনা করতে পারতাম আর চটজলদি আকর্ষণীয় হেডিং লিখতে পারতাম। এ কারণে বেশির ভাগ সময় আমাকে রাতের পালায় কাজ দেওয়া হতো। পরের দিন ১১টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে চলে যেতাম আন্দোলনের কাজে। অফিসের ফাঁকে ফাঁকেও বিভিন্ন সভায় যেতাম। সাংগঠনিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হই। সংবাদ সেই অর্থে জনপ্রিয় পত্রিকা ছিল না। ১৯৬৯ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় এই পত্রিকার প্রথম পাতায় সাহসী ও আকর্ষণীয় হেডিং করে আমি প্রশংসিত হই। এ কারণে সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী আমাকে পছন্দ করলেও বকাঝকা করতে ছাড়তেন না।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের দিন আমি হেডিং করেছিলাম– 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'। ব্যস, আর যাই কোথায়! জহুর ভাইয়ের হুকুম– এটা লেখা যাবে না। আমিও অনড়। এ বাক্য দিয়েই হেডিং করা হবে। নইলে কাল থেকে সংবাদ প্রকাশিত হবে না। হলোও তাই। আমার মতো করে 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই হেডিং ব্যানার করে ৮ মার্চ সংবাদ প্রকাশিত হলো। এই স্মৃতি কি ভোলার? ১৯৮৭ সালে এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে ৩২ জন বিবৃতি দিয়েছিল। আমি তখন ইত্তেফাকে। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সরকারের মন্ত্রী। এই অবস্থায় সাহসের সঙ্গে সেই বিবৃতি ছেপে সরকার ও কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়েছিলাম। আমি সাসপেন্ড হয়েছিলাম। আমার ৫০ বছরের সাংবাদিকতা জীবনে এ দেশের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশের এমন অনেক অম্লমধুর, উত্থানপতনের স্মৃতি আছে, যা ভোলার নয়। এর মধ্যে প্রধান হচ্ছে– সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার ঘটনা, যা ভাবলে আজও আমি শিউরে উঠি। আমার সাংবাদিক জীবন নিয়ে লেখা পরবর্তী বইয়ে আপনারা এগুলো পাবেন।

প্রশ্ন: এ সময় কোন কোন সাংবাদিকের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, যা ছিল আপনার প্রেরণা?

গোলাম সারওয়ার: আমি আসলে একজন ভাগ্যবান মানুষ। বানারীপাড়া থাকতে যে সাংবাদিক, লেখকরা ছিল আমার স্বপ্নের মানুষ, এই পেশায় এসে তাঁদের অনেককেই পেয়েছি সহকর্মী হিসেবে। জহুর হোসেন চৌধুরী, রণেশ দাশগুপ্ত, শহীদুল্লা কায়সার, সত্যেন সেন, বজলুর রহমার, আলী আকসাদ, আসাফউদ্দৌলা রেজা, কেজি মোস্তফা, কামাল লোহানী, ফজলে লোহানী, রোকনুজ্জামান দাদা ভাই আরও কত জন! তবে দূর থেকে যাদের খুব স্বাধীনচেতা সাহসী মানুষ মনে হতো, কাছে এসে কাউকে কাউকে দেখেছি বড্ড ভীতু আর আপসকামী।

প্রশ্ন: যে ইত্তেফাক আপনাকে দেশের শ্রেষ্ঠ বার্তা সম্পাদকে পরিণত করেছিল, এবার বলুন আপনার সেই ইত্তেফাক জীবনের কথা।

গোলাম সারওয়ার: পাকিস্তান সরকার ইত্তেফাক বন্ধ করে দেওয়ার পর আসাফউদ্দৌলা রেজা আবার সংবাদে চলে যান বার্তা ও নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে। যুদ্ধ শেষে শিক্ষকতা বাদ দিয়ে আমিও আবার যোগ দিলাম সংবাদে। সংবাদের পরিবেশ তখন অনেক বদলে গেছে। গ্রুপিং চলছে মুক্তিযোদ্ধাদের ভেতর। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবদুল্লা আল মামুন এ সময় সংবাদ ছেড়ে ইত্তেফাকে চলে যায়। আমাকেও অনুরোধ করে ইত্তেফাকে চলে আসতে। এ সময় ইত্তেফাকের প্রস্তাবটি গ্রহণ করলাম। ১৯৭২ সালে যোগ দিলাম ইত্তেফাকে সিনিয়র সাব-এডিটর হিসেবে। তারপর দীর্ঘ ২৭ বছর এই পত্রিকার পেছনে আমি আমার শ্রম, মেধা, ঝুঁকি, ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছি। পত্রিকাটির জনপ্রিয়তা এতই ছিল যে, কোনো অনুষ্ঠানে ইত্তেফাকের রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার না এলে অনুষ্ঠান শুরু হতো না। এখানে আমি ঝুঁকি নিয়ে নানা পদক্ষেপ নিয়েছি। যেমন– খেলার পাতাকে জনপ্রিয় করার জন্য মালিক পক্ষের এবং রেজা ভাইয়ের প্রবল বিরোধিতার মুখেও বড়ো বিজ্ঞাপন প্রকাশ বন্ধ করেছিলাম। সময়ের সঙ্গে থাকার জন্য হেডিংয়ে সাধু ভাষার ব্যবহার আমিই বন্ধ করেছিলাম। এজন্য কম যুদ্ধ করিনি। আমি মালিক পক্ষকে বোঝাতে পেরেছিলাম– মানিক মিয়ার রীতি অনুযায়ী সম্পদকীয়তে সাধু ভাষা থাক; কিন্তু খবরে সাধু ভাষা থাকবে না। পাঠক তা চায় না। একদিন তো মূসা ভাই (এবিএম মূসা) বলেই ফেললেন, 'সারওয়ার তুই কত বড়ো সাংবাদিক জানি না। তবে তুই বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বার্তা সম্পাদক।

১৯৯৯ সাল পর্যন্ত আমি এই পত্রিকার যথাক্রমে প্রধান সহসম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করি। ব্যাপক চাহিদার কারণে পত্রিকাটি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতো। আমি এদেশের সংবাদপত্রে প্রথম দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথা প্রবর্তন করি। শুধু খবর নয়, পত্রিকাটির খেলাধুলার পাতা, অন্যান্য সংবাদভিত্তিক ফিচার পাতার পাঠকপ্রিয়তা ছিল ঈর্ষণীয়। এখনো আমি প্রতিদিন দেশের দুটি পত্রিকার অন্তত হেডলাইন দেখি– একটি ইত্তেফাক, অন্যটি যুগান্তর।

প্রশ্ন: ইত্তেফাক থেকে এলেন কেন?

গোলাম সারওয়ার: ইত্তেফাকে আমি শুধু বার্তা সম্পাদকই ছিলাম না, নীতি-নির্ধারণের সঙ্গেও জড়িত ছিলাম। ওখানে সমস্যা ছিল দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্ব, যা অনেক সময় ভয়াবহ রূপধারণ করত। প্রেসের কর্মচারীরাও খুব শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান ছিল। দুই ভাইয়ের দুই গ্রুপ। এক পক্ষের ইন্ধনে কামাল নামে এক প্রেস কর্মচারী মারা যায়। অফিসে তুমুল উত্তেজনা। পরের দিন পত্রিকা বের হবে কি না, তা নিয়েও সংকট সৃষ্টি হলো। একপক্ষ প্রকাশের পক্ষে, অন্যপক্ষ প্রকাশের বিরুদ্ধে। দুই পক্ষই এলো আমার কাছে। রাত ১২টার দিকে আমি আমার রুমে বসে মিটিং করছি। এ সময় পাশের ভবন থেকে আমাকে টার্গেট করে গুলি ছোড়া হলো। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গুলিটি কর্মচারী মান্নানের মাথায় লাগল। সঙ্গে, সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। এ মর্মান্তিক ঘটনার পর আমি ইত্তেফাক ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিই।

প্রশ্ন: আপনার যুগান্তর জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা জানতে চাই?

গোলাম সারওয়ার: আমি যুগান্তরের সম্পাদক হিসেবে যোগদানের পর এটিকে জনপ্রিয় ও সত্যনিষ্ঠ করার প্রতি মনোযোগী হই। প্রকাশের তিন মাস আগে থেকে দেশব্যাপী চষে বেড়িয়েছি। আমার উদ্দেশ্য ছিল নতুন পাঠক তৈরি করা। প্রকাশের পর দিনের মধ্যে প্রত্যন্ত জনপদে পত্রিকা পৌঁছানোর উদ্যোগ নিই। এতে লস হলেও পত্রিকা জনপ্রিয় হয়েছিল। খবরের বিষয়ের ব্রেকথ্রু এই পত্রিকাটিকে জনপ্রিয় করে। যেমন, ইরাক যুদ্ধের খবর, অস্ত্র হাতে ডা. এইচবিএম ইকবালের ছবি প্রকাশ– এরকম বহু ঘটনা পত্রিকাটিতে ব্রেকথ্রু এনে দেয়। তখন যুগান্তরের এত চাহিদা যে, প্রায় দুপুর পর্যন্ত পত্রিকা ছাপা হতো। এখন সাইফুল আলম ভালোভাবে চালাচ্ছে পত্রিকাটি। এখনো হেডিং নিয়ে ওকে ফোনে উপদেশ দিই।

প্রশ্ন: আপনি এ দেশের বিনোদন সাংবাদিকতাকে জনপ্রিয় করেছেন, বাচসাসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। এ ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা জানতে চাই। সেই সঙ্গে পূর্বাণীর নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে আপনার অভিজ্ঞতার কথাও।

গোলাম সারওয়ার: শিল্প-সংস্কৃতি আমাকে বরাবরই টানত। বিশেষ করে চলচ্চিত্র। সেই পঞ্চাশের দশকে বালক বয়সে এ দেশের প্রথম চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' দেখার জন্য ঢাকায় ছুটে গেছি। দিলিপ কুমার, মধুবালা, মিনাকুমারী, মনোজকুমার, রাজেন্দ্র কুমার, নার্গিস, কাননবালা, সুচিত্রা, উত্তম– তাঁদের ছবি দেখার জন্য কলকাতা পর্যন্ত ছুটে যেতাম। কলকাতার 'উল্টোরথ পত্রিকার পাঠক ছিলাম। বাসায় ঝিনুক, চিত্রালীসহ অন্যান্য সিনে জার্নাল রাখতাম। এ দেশে শবনম-রহমান জুটির ভক্ত ছিলাম।

ঢাকায় আসার পর ওবায়েদ উল হক, ফজলুল হক, রাবেয়া খাতুন, হুসনা বানু খানম, ফতেহ লোহানী, মীজানুর রহমান, আসিরুদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ, আজিজ মিসির, গাজী শাহাবুদ্দীন আহমেদ, মহিউদ্দীন, সৈয়দ শামসুল হক, ফজল শাহাবুদ্দীন, খান আতাউর রহমান, জহির রায়হান, সৈয়দ শাজাহান, সাইফুদ্দীন চৌধুরী, জয়নুল অবেদীন, এটিএম আবদুল হাই প্রমুখের সান্নিধ্য আমাকে এই জগতের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে। আমি মনে করি, বিনোদন জগতের খবর রাজনৈতিক খবরের মতোই জনপ্রিয়। তাই এ ক্ষেত্রটিকে আলাদাভাবে গুরুত্বের সঙ্গেই দেখতে হয়।

বাকশাল গঠনের পর চারটি পত্রিকা জাতীয়করণ করে বাকি সব বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি দেওয়া হয়। তখন আমার ওপর চাপও কমে আসে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তো আমাকে দিয়ে কাজ করাবেই।

ইত্তেফাক প্রকাশনায় 'পূর্বাণী' নামে একটি সিনে পত্রিকা ডিক্লারেশন ছিল মালিকপক্ষের মামা খন্দকার শাহদাত হোসেনের নামে। আমাকে এই পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক করা হলো। নামমাত্র সম্পাদক– সব দায়িত্বই ছিল আমার। ১৬ পাতার এ পত্রিকাটি ছিল শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিনির্ভর। আমি প্রথম এখানে কলকাতার উল্টোরথের পূঁজা সংখ্যার স্টাইলে পূর্বাণীর ঈদ সংখ্যা প্রকাশ করি। দিনরাত পরিশ্রম করে এর সার্কুলেশন ৭০ হাজারে নিয়ে যাই, যা চিত্রালীকেও ছাড়িয়ে যায়। তবে আবার মালিকপক্ষের অনুরোধে আমাকে যুগ্ম সম্পাদক পদে ইত্তেফাকে ফিরে আসতে হয়। যুগ্ম সম্পাদক পদটিও আমার জন্য তখন সৃষ্টি করা হয়।

আমি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি (বাচসাস)-এর একাধিকবার সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি। এই শিল্পের বহু সংকটে এগিয়ে এসেছি। একটি ঘটনা বলি, রাজ্জাকের জনপ্রিয়তা তখন তুঙ্গে। রাজ্জাক-শবনমকে নিয়ে অশোক ঘোষ 'নাচের পুতুল' ছবিটি নির্মাণ করেন। শবনম তখন পাকিস্তানের এক নম্বর নায়িকা। অভিনয়জগতে রাজ্জাকের সিনিয়র। এটা ভেবে চিত্রালীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে আহমদ জামান চৌধুরী শবনমের নামটি রাজ্জাকের আগে দেন। ব্যস আর কোথায় যায়! ঢাকা ক্লাবে এসে রাজ্জাক আহমেদ জামান চৌধুরীকে মেরে ফাটিয়ে দিলেন। বাচসাসের জরুরি সভা ডাকলাম। সিদ্ধান্ত হলো রাজ্জাক প্রকাশ্যে আহমদ জামান চৌধুরীর কাছে ক্ষমা না চাইলে তাঁর কোনো খবর সাংবাদিকরা ছাপবে না। শেষ পর্যন্ত রাজ্জাককে ক্ষমা চাইতে হয়। এরকম বহু সমস্যার সমাধান আমি করেছি।

প্রশ্ন: আপনাকে শিরোনামের কাব্যিক মাস্টার বলা হয় কেন?

গোলাম সারওয়ার: আমি সবসময় খবরের সঙ্গে থাকি। এখন স্মার্টফোনের কল্যাণে অফিসে যেতে যেতে দেশ-বিদেশের অনেক পেপারের শিরোনাম দেখে ফেলি। আমার ফোনে ১০টি দেশের ৫০টি পত্রিকা আছে। বিশ্বব্যাপী পত্রপত্রিকায় শিরোনাম নিয়ে নানা নিরীক্ষা চলছে। আমরা কেন পিছিয়ে থাকব? আমি মনে করি, অর্থবহ ক্যাচি শিরোনাম খবরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। খবর হচ্ছে একটি পণ্য, যা পাঠক ক্রয় করে। তাই তাকে তো স্মার্ট ও আকর্ষণীয়ই করা উচিত। আমি খবরের শিরোনামে কাব্যিক ভাবের পক্ষে। আর আমি তো বাংলা ভাষায় সাংবাদিকতা করি। বাংলা তো কাব্যিক শব্দের খনি। অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি এখানে। আমাদের আছে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল। এখান থেকে যা পারি ব্যবহার করি না কেন? ইত্তেফাকে খুব রক্ষণশীলতা ছিল। সেখানে আমার স্বাধীনতার ওপর রেজা ভাই ও অন্যরা কাঁচি চালাত।

কিন্তু যুগান্তর, সমকালে আমার স্বাধীনতার ওপর কেউ হাত দেয়নি। তাই হয়তো প্রশংসা পাচ্ছি।

প্রশ্ন: সাংবাদিক ইউনিয়ন বিভক্ত। এতে লাভ-ক্ষতি কার হলো?
গোলাম সারওয়ার: ইউনিয়ন যে দিন ভেঙে গেল, সেদিন আমার চোখে পানি ছিল। ক্ষমতার রেষারেষিতে ভাঙল ইউনিয়ন। লাভ হলো মালিকপক্ষের। একটার পর একটা ওয়েজ বোর্ড হলো, বাস্তবায়ন হলো খুব কম পত্রিকায়। এখন পত্রিকা আর চ্যানেলের ছাড়াছড়ি। কিন্তু ওয়েজ বোর্ড অনুযায়ী বেতন নেই। দরকষাকষির উপায় নেই। বরং নবম ওয়েজ বোর্ড ঘোষণার পর বহু হাউস থেকে সাংবাদিক ছাঁটাই হলো। গণতন্ত্রের মতো এই পেশায়ও বহু মত থাকবে। তাই বলে পেশার ওপর আঘাত আসবে কেন? ইউনিয়ন এক না হলে এই অবস্থার উত্তরণ ঘটবে না।

প্রশ্ন: শোনা যায় আপনি একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সমর্থক। সেই দল থেকে এবার নির্বাচনে মনোনয়ন পাচ্ছেন। আপনার এই রাজনৈতিক সত্তার কারণে নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার ওপর প্রভাব পড়ে কি?
গোলাম সারওয়ার: শোনা যায় আবার কী? সরাসরিই বলি, আমি আওয়ামী লীগের সমর্থক। আমি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বিশ্বাসী। মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাসী। আমি মুক্তিযুদ্ধ করেছি। আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার সপক্ষ শক্তি, তাই এই দলের প্রতি আমার অনুরাগ।

রাজনৈতিক বিশ্বাস আমার ব্যক্তিগত। কিন্তু আমি যখন সাংবাদিক, তখন আমি নিরপেক্ষ। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত যখন এই দলটি ক্ষমতায় ছিল, তখন আমি ইত্তেফাকে। তখন আমার হাত দিয়ে যে খবরগুলো যেত, সেগুলো কি নিরপেক্ষ ছিল না? অথবা যুগান্তরে, এখন সমকালে নিরপেক্ষ খবর যাচ্ছে না? আমি যখন বার্তা সম্পাদক বা সম্পাদকের চেয়ারে বসি, তখন আমার সামনে থাকে জনগণ-পাঠক-দেশ-আন্তর্জাতিক বিশ্ব।

আমি আসন্ন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন পাচ্ছি কি না জানি না। আমি আমার এলাকার একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। সেই কাজে আর জন্মভূমির টানে বানারীপাড়ায় সুযোগ পেলেই চলে যাই। তাই সবার অনুমান আমি নির্বাচন করছি।

প্রশ্ন: আপনি বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান হিসেবে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছেন?
গোলাম সারওয়ার: সেটা আলমগীরই (মো. শাহ আলমগীর, মহাপরিচালক, পিআইবি) ভালো বলতে পারবে। পিআইবির কাজ সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, গবেষণা করা, প্রকাশনা। এটি অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো আমলাতান্ত্রিক নয়। প্রশিক্ষণ থেকে অবশ্যই কিছু না কিছু শেখা যায়। এখানে প্রশিক্ষণ, ডিপ্লোমা ছাড়াও খুব শিগগিরই সাংবাদিকতায় এমএ ক্লাস শুরু হবে, যা নতুনদের দৃষ্টি খুলে দেবে। এই সুযোগ আমরা পাইনি, এখনকার জেনারেশন পাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণাগুলো আমাদের সামনে অজানা সত্য ইতিহাসকে তুলে ধরেছে। লাইব্রেরিতে মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রচুর বইপত্র আছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে পড়াশোনা করা যায় এখন, যা আগে হতো না।

শত ব্যস্ততার মাঝেও আমি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে, নীতিনির্ধারণী মিটিংয়ে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করি। নির্দেশনা দিয়ে থাকি। আমার জানামতে, প্রতিষ্ঠানটি শিগগিরই অ্যাক্টের আওতায় আসবে। তখন এর কর্মপরিধিতে যে সীমাবদ্ধতা আছে, তা কেটে যাবে। আর আলমগীর তো শক্ত হাতে, যোগ্যতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করছে।

প্রশ্ন: এত সাফল্যের ভেতরে কোথাও কি অপূর্ণতা আছে?
গোলাম সারওয়ার: সাংবাদিক জীবনের ব্যস্ততার ভেতরে হারিয়ে গেছে আমার লেখকসত্তা। আমি ছড়া লিখতাম, গল্প লিখতাম। আমার এই প্রিয় গুণ দুটিকে খেয়ে ফেলেছে সাংবাদিক জীবন। এটি এখনো আমাকে কষ্ট দেয়। জীবনে অবসর পাব কি না জানি না। তবে অবসর পেলে আমি ছড়া আর গল্পের জন্য কলম ধরব। পরিবারকে সময় দিতে পারিনি সেভাবে। সন্তানদের শিশুকাল, আধো আধো কথা বলা, বেড়ে ওঠা– এগুলো উপভোগ করতে পারিনি। এগুলো ভাবলে আবেগতাড়িত হয়ে পড়ি।

প্রশ্ন: জীবনের কোন ঘটনাকে আপনি বেশি আনন্দময় মনে করেন?
গোলাম সারওয়ার: জাতীয় প্রেস ক্লাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর মুরাল স্থাপন করতে পেরে জীবনে সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছি। এই মুরাল স্থাপনের অন্যতম ভূমিকা ছিল আমার। যারা বঙ্গবন্ধুর অবদানকে অস্বীকার করে, তারা দীর্ঘদিন ক্লাবটি চালিয়েছে। যার জন্য আজ আমাদের স্বাধীনতা, সেই বঙ্গবন্ধুর নাম এখানে উচ্চারিত হতো না। স্বাধীনতার পক্ষ শক্তির সাংবাদিকদের সদস্যপদ দেওয়া হয়নি দীর্ঘদিন। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ের অবসান ঘটেছে। এখন বিশেষ দিনগুলোয় ফুলে ফুলে ভরে যায় বঙ্গবন্ধুর ছবি। এটা আমাকে বড্ড তৃপ্তি দেয়, আনন্দ দেয়।

প্রশ্ন: আপনার একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের কথা জানতে চাই।
গোলাম সারওয়ার: মা-বাবার পরে যে মানুষটি আমাকে আগলে রেখেছে, তিনি আমার স্ত্রী সালেহা সারওয়ার। আর আমার তিন সন্তান। আমার জীবনের যে ব্যস্ততা, তাতে আমি সংসার আর সন্তানদের সময় দিতে পারিনি। সবকিছু আগলিয়েছে আমার স্ত্রী। সব পুরুষের সাফল্যের পেছনে থাকে একজন নারী আর নারীর সাফল্যের পেছনে থাকে একজন পুরুষ। আমার পেছনেও আছে আমার স্ত্রী। তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী, গবেষক

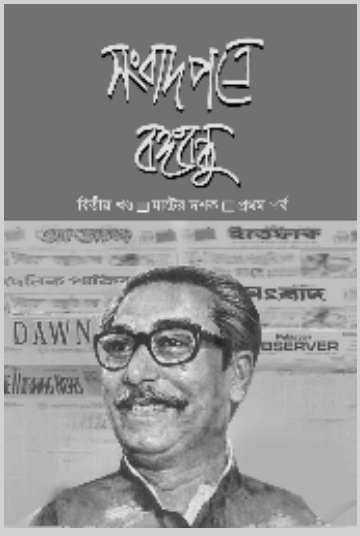

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

ফটো অ্যালবাম: গোলাম সারওয়ার

রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের সঙ্গে বঙ্গভবনে

তারুণ্যে গোলাম সারওয়ার

বিয়ের পর (১৯৬৫) স্ত্রী সালেহা সারওয়ারের সঙ্গে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে একুশে পদক গ্রহণ (২০১৪)

সমকাল প্রকাশক এ. কে. আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক ও গোলাম সারওয়ার

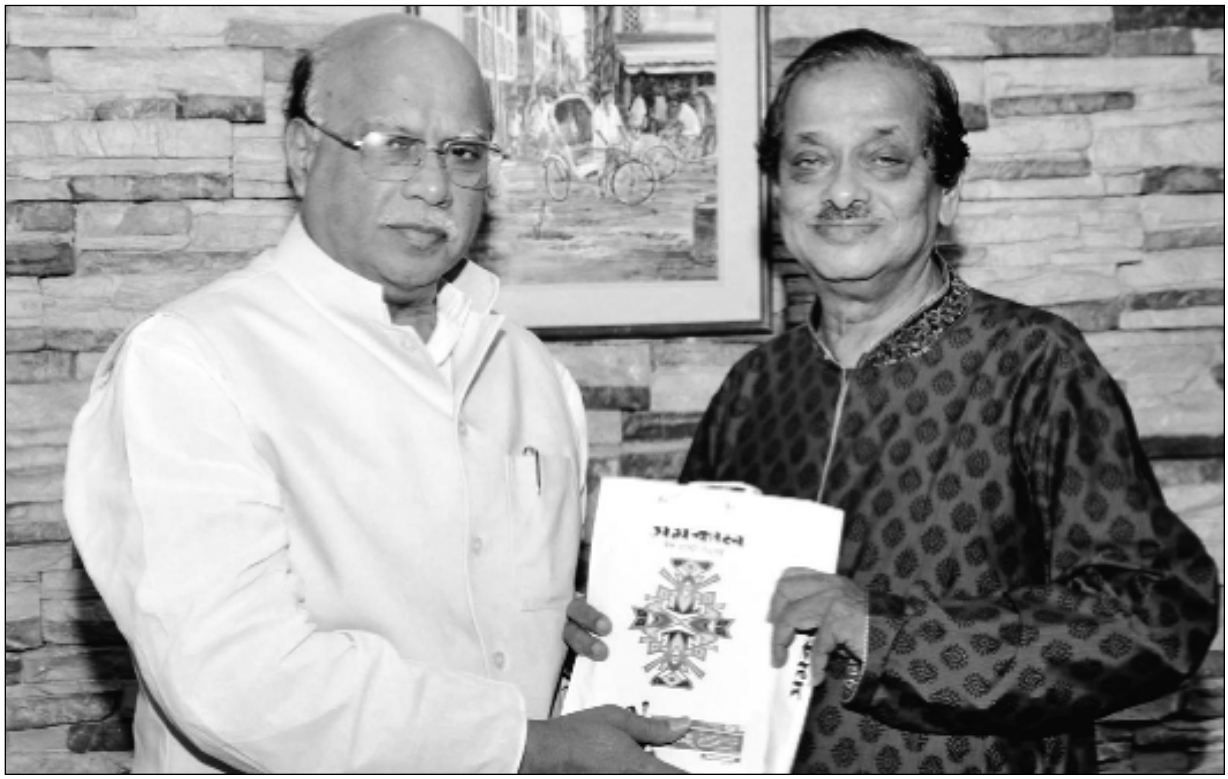

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ও গোলাম সারওয়ার

ইমদাদুল হক মিলন ও কবরী সারোয়ারের সঙ্গে সস্ত্রীক গোলাম সারওয়ার

অফিস কক্ষে কর্মরত গোলাম সারওয়ার

প্রকাশিত গ্রন্থ

৭৫তম জন্মদিনে (বাঁ থেকে) কনিষ্ঠ পুত্র অঞ্জন, রচনা, স্ত্রী, কন্যা রত্না ও জামাতা মিয়া নাইম হাবিবের সঙ্গে

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে

শিক্ষক ও ছাত্র— অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ও গোলাম সারওয়ার

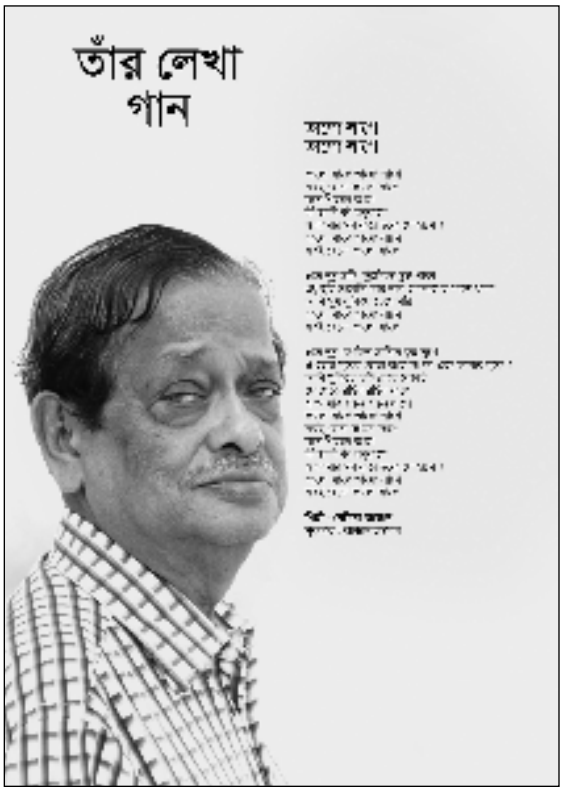

দুই নাতনি কাশতি ও নিশাত

নাতি স্পর্শ

ছবি কৃতজ্ঞতা: *কালের খেয়া, দৈনিক সমকাল, ১৭ আগস্ট ২০১৮*

নির্বাচন ও তথ্য অধিকার

কামরুল হাসান মঞ্জু

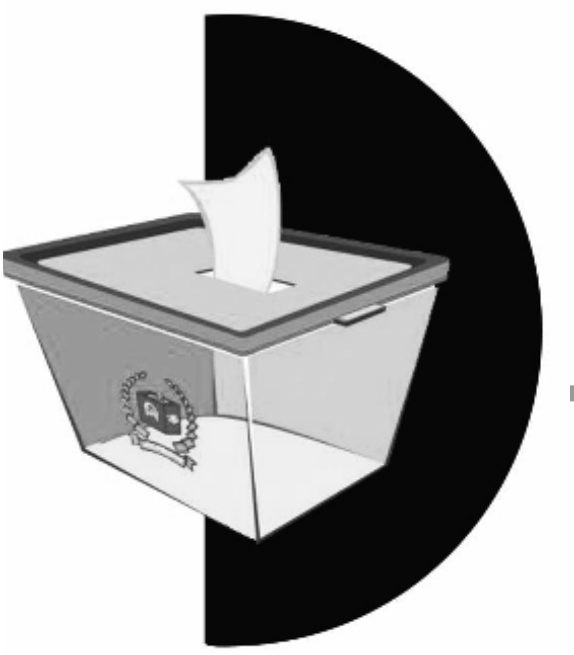

অনেক প্রতীক্ষার পালা শেষে সরকার বাংলাদেশের মানুষের বহুকাঙ্ক্ষিত তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছে। এই আইনের ফলে মানুষের জন্য সরকারি-বেসরকারি, বাণিজ্যিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে সুলভে ও সহজে তথ্যপ্রাপ্তির পথ প্রসারিত হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে জীবনমান উন্নয়নে তথ্য ব্যবহারের সুযোগ। জনমানুষের তথ্যচাহিদা পূরণের জন্য ও প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার সামনে নিয়ে দায়িত্ব গ্রহণের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ঘোষণা দেয়। সে অনুযায়ী তথ্য মন্ত্রণালয় এ আইনের খসড়া অধ্যাদেশের ওপর জনসাধারণের মতামত গ্রহণের জন্য ১৮ থেকে ৩১ মার্চ ২০০৮ তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে অধ্যাদেশটি উন্মুক্ত করে। প্রস্তাবিত খসড়া অধ্যাদেশের ওপর দেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভার মাধ্যমে সাংবাদিক, আইনজীবী, শিক্ষক, উন্নয়নকর্মী, রাজনৈতিক নেতা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মকর্তাসহ সাধারণ জনগণ খসড়া অধ্যাদেশটি জনবান্ধব করে শিগগিরই প্রণয়নের জন্য নানাবিধ সুপারিশ প্রদান করে এবং অবশেষে তথ্য অধিকার অধ্যাদেশ প্রণীত হয়। এর পর সেটা আইনে রূপ নেয়।

দেশে প্রয়োজন একটি অংশগ্রহণমূলক প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক সরকার। আর এ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্যই দরকার জনগণের জন্য সৎ ও যোগ্যপ্রার্থী নির্বাচন করার পথ নির্মাণ করা। কারণ কেবল সৎ-যোগ্য প্রতিনিধি আইনের শাসন ও সাংবিধানিক নিয়ম-শৃঙ্খলার মাধ্যমে জনগণের সেবা করতে পারে। এই অভিজ্ঞতার আলোকে ভোট প্রদানের অধিকার রাখে এমন প্রত্যেক নাগরিক আজ তার প্রার্থী বাছাইয়ের আগে জানতে চায় প্রার্থীর সার্বিক ইতিবৃত্ত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সংহত করতে হলে ভোটারদের দিতে হবে নির্বাচনে যোগ্য ও প্রার্থীর সার্বিক তথ্য জানার অধিকার। কারণ জনগণের জ্ঞাত অংশগ্রহণই গণতন্ত্রকে দেয় প্রাণশক্তি। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভোট প্রয়োগ করার আগে প্রার্থী সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা নেওয়া দেশের নাগরিকরা আজ জরুরি মনে করছে। কারণ যারা নির্বাচনে নির্বাচিত হবেন তারাই দেশের ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক কাঠামোকে পুনর্নির্মাণ করায় ভূমিকা রাখবেন। ভবিষ্যতের নতুন বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে প্রার্থীরা এলাকার মানুষের প্রতি কতটুকু

যে কোনো সচেতন নাগরিক সংগত কারণে নির্বাচনের সময় জানতে চাইবে প্রার্থীর তালিকা, প্রার্থীদের ব্যক্তিচরিত্রের স্বভাব, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও অভিজ্ঞতার ইতিহাস। এছাড়া প্রার্থীর অতীতের কোনো দুষ্কর্মের জন্য অপরাধী হয়ে জেল-হাজত খেটেছেন কি না

অঙ্গীকারবদ্ধ থাকবেন তা নির্ভর করবে তাদের রাজনৈতিক আদর্শ, সামাজিক অঙ্গীকার ও জনগণকে সেবা দেওয়ার দক্ষতার ওপর। সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের পূর্বশর্ত হিসেবে তাই সক্রিয়ভাবে ভোটারদের জানার অধিকার নিশ্চিত করাই আজকের অঙ্গীকার– এটাই বর্তমান সরকারের কাছে জনসাধারণের প্রত্যাশা।

সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন প্রশ্নে তথ্যের বিকল্প নেই। কারণ নির্বাচনি স্বচ্ছতার প্রশ্নে ভোটারদের জানার অধিকার নিশ্চিত করা না হলে অনুষ্ঠিত নির্বাচন নিয়ে অস্বচ্ছতার প্রশ্ন ওঠে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ আইন পাসের ফলে এ আইনের অধীনে যে কোনো ভোটদাতা নাগরিককে প্রার্থীর যোগ্যতা, ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়া, সংস্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন পদ্ধতিতে কী কী পরিবর্তন আনা হয়েছে সেসব বিষয় ভোটারদের জানানোর এবং জানার পথ অবমুক্ত হয়েছে।

যে কোনো সচেতন নাগরিক সংগত কারণে নির্বাচনের সময় জানতে চাইবে প্রার্থীর তালিকা, প্রার্থীদের ব্যক্তিচরিত্রের স্বভাব, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ও অভিজ্ঞতার ইতিহাস। এছাড়া প্রার্থীর অতীতের কোনো দুষ্কর্মের জন্য অপরাধী হয়ে জেল-হাজত খেটেছেন কি না, ফৌজদারি আদালতে তার নামে কোনো মামলা আছে কিনা, প্রার্থীর পেশা কী এবং তার ধন-সম্পত্তি ও আয়ের উৎস বৈধ কি না, দেশের কোনো ব্যাংক কর্তৃক ঋণখেলাপি ঘোষিত হয়েছেন কি না, প্রার্থী হওয়ার জন্য শিক্ষাদীক্ষা সন্তোষজনক কি না, সমাজের কাছে অতীত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড গ্রহণযোগ্য কি না এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মতো অপরাধে তিনি জড়িত কি না, তা ভোটাররা জানতে চাইবে। সবারই মনে রাখা প্রয়োজন যে, গোটা নির্বাচনি প্রচারণা সম্পর্কে ভোটারদের জানার অধিকার অন্যতম মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। ভোটারদের জন্য তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগ যত সম্প্রসারিত হবে, তত নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় ভোটারদের অংশগ্রহণ বেশি ত্রুটিমুক্ত হবে।

ভোটারদের জন্য সঠিক তথ্যপ্রবাহ নির্ধারণ করে নির্বাচনকে কার্যকর, ফলপ্রসূ ও প্রশ্নমুক্ত রাখার ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। কারণ এর আওতায় নির্বাচন কমিশন সঠিকভাবে নির্বাচন করার মধ্য দিয়ে জনগণের কাছে তার প্রাতিষ্ঠানিক দায় নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।

লেখক: বিশিষ্ট গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব ও অগ্রজ আবৃত্তি শিল্পী

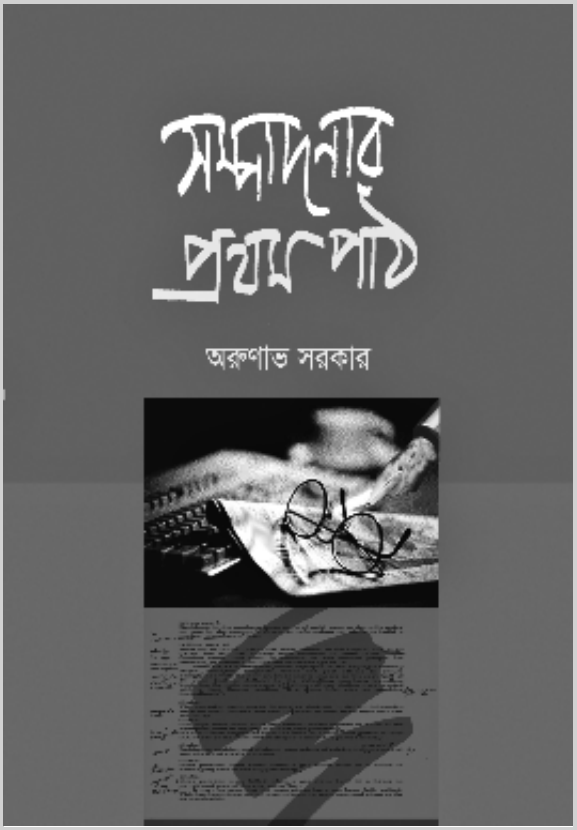

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

বিশ্বায়িত মিডিয়ার জমানায় রাজনীতিতে ইন্টারনেটের ভূমিকা

ড. মাহাবুবুর রহমান

নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তির মধ্যে বর্তমানে ইন্টারনেটকেই সবচেয়ে শক্তিশালী মনে করা হয়। Jurgen Rudolph-এর মতে, 'যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে গুটেনবার্গের মুদ্রাক্ষর যন্ত্র কিংবা স্যামুয়েল মোর্সের টেলিগ্রাফের চেয়ে এটি অধিক শক্তিশালী এবং মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী (Rudolph, 2006)।' তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী মানুষের ভাষা ও জীবনধারা বদলে দিচ্ছে। বদলে দিচ্ছে পৃথিবী ও মানবসভ্যতার চেহারা। বর্তমান সময়ে নয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উৎকর্ষের এমন স্থানে পৌঁছে গেছে যে ধারণা করা হচ্ছে, সারা পৃথিবীতে তথ্যবিপ্লব ঘটে গেছে। আর তাই দ্রুত বিকাশমান এই যোগাযোগ প্রযুক্তি রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম, মানোন্নয়ন, অংশীদারিত্বমূলক রাজনৈতিক যোগাযোগপ্রবাহ সৃষ্টি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে আরও সুদৃঢ় ও সুসংহত করার ক্ষেত্রে কী ভূমিকা রাখতে পারে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বর্তমানে আলোচিত হচ্ছে।

Stephen Warel এই আলোচনার সূত্র ধরেই বলেন, 'The arrival of the internet has added further immediacy to existing concerns about the role and health of political organizations and representative democracy in general (Ward, 2002)। রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম এবং অংশগ্রহণমূলক প্রতিনিধিত্বশীল চৈতন্যকে জোরদার করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য ইন্টারনেট বা নয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে সমকালীন রাজনীতি, গণতন্ত্র ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। অবশ্য এই ধারণার বিপক্ষে পাল্টা যুক্তিও দেন অনেকে। (রশিদ, ২০০২)। যেমন- কেউ কেউ মনে করেন, নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার রাজনীতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে এবং গণতান্ত্রিক ধারাকে আরও সুসংহত করতে পারে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিদ্যমান আধিপত্যশীল ক্ষমতাবান রাজনৈতিক দলগুলো আরও পরিকল্পিত ও সুসংগঠিতভাবে ক্ষমতার দাপট দেখাতে পারবে, ক্ষমতা হবে কেন্দ্রীভূত আরও এককেন্দ্রিক। সাম্প্রতিক সময়ে ব্যক্তি এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেটের ব্যবহার নিয়ে বেশকিছু প্রায়োগিক ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে।

> *রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে থাকে এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ অনেকাংশেই প্রচলিত গণমাধ্যমের ওপর নির্ভর করে, যদিও এটি নিয়ে তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ... ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রাপ্ত রাজনৈতিক তথ্য সংবাদমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব যুক্ত করেছে*

বিশ্বায়িত গণমাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেট

বর্তমান বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে মিডিয়া বা গণমাধ্যমের অবস্থান সমাজের একেবারে কেন্দ্রে। আর ইন্টারনেটকে বলা হচ্ছে উন্মুক্ত গণমাধ্যম, যেখানে অবাধে যে কেউ বিচরণ করতে পারে এবং নিজের মতামত শেয়ার করতে পারে। বিশ্বায়নের আবির্ভাব যেমন বিশ্বের সমগ্র প্রেক্ষাপটে গতিশীলতার সৃষ্টি করেছে, তেমনি সে গতিশলীলতার প্রভাব গণমাধ্যমেও স্পষ্ট। কেননা গণমাধ্যমের অবাধ তথ্য সরবরাহের মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বের মানুষ একদিকে যেমন একীভূত হচ্ছে, রূপান্তরিত হচ্ছে, তেমনি বিশ্বগ্রামেও সবাইকে একত্রিত করছে। যদিও এ একীভূতকরণ সহজ কোনো প্রক্রিয়া নয়। (Crowther, 1997)। যাই হোক না কেন, বিশ্বায়নের এ গতিশীলতার ফলে পুঁজিবাজারের যে সম্প্রসারণ ঘটেছে, তা প্রভাবিত করেছে সংবাদ, তথ্য এবং সাংবাদিকতা তথা গণমাধ্যমকে এবং সেই সঙ্গে রাজনীতিতেও পড়ছে এর বিপুল প্রভাব।

বিশ্বায়নকালে বৈশ্বিক মিডিয়ার ক্রমাগত মার্জার ও কেন্দ্রীকরণের ফলে গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে একই সঙ্গে বাণিজ্যিকীকরণ ও উদারনৈতিক বিষয়াবলির প্রবেশ ঘটেছে। বৈশ্বিক মিডিয়ার ভূমিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাজারের পক্ষে কাজ করা, করপোরেট কালচার সরবরাহ করা, ভোক্তাসংস্কৃতি উপহার দেওয়া, হালকা বিনোদনে অডিয়েন্সকে বুঁদ করে রাখা, বিজ্ঞাপনের জোয়ারে ভাসিয়ে দেওয়া, সর্বোপরি সমাজে বিদ্যমান প্রকৃত সমস্যা ও বৈষম্য থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে অগভীর বিনোদন দিয়ে ব্যস্ত রাখা। এর মাধ্যমে উন্নত বিশ্বের ভোক্তা-সংস্কৃতি প্রান্তিক দেশের মিডিয়াগুলোও অকাতরে গ্রহণ করছে। সেই সঙ্গে ইন্টারনেটের বদৌলতে বিশ্বের উন্নত রাজনৈতিক চেতনা যেমন– প্রান্তিক দেশগুলো গ্রহণ করছে, রাজনৈতিক দলগুলো আরো উন্নত, সুগঠিত, সুসংহত হচ্ছে, একই সঙ্গে রাজনৈতিক আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করছে উন্নত বিশ্ব। ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির অগ্রগতির চেয়ে অবনতি বেশি ঘটছে এবং সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে উন্নত বিশ্ব। (আহমেদ, ২০১১)।

বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এরা বর্তমানে একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। আর তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশ্বায়ন ও গণামাধ্যমের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। বহুজাতিক করপোরেশন এবং বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিনিয়তই গণমাধ্যমের ওপর নির্ভর করে থাকে। স্থানীয় ও আঞ্চলিক গোষ্ঠী যারা বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধা দেয় বা প্রতিহত করে, তাদের জন্যও গণমাধ্যম একটি কার্যকর হাতিয়ার। (রশিদ, ২০০৬)। তাই বলা যায়, বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যমের সম্পর্ক পরস্পরের পরিপূরক। বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যম পাশাপাশি চলছে। ফলে মিডিয়ারও বিশ্বায়ন ঘটছে। আর ইন্টারনেট তার সেতু হিসেবে কাজ করছে। যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন বিশ্বায়ন প্রক্রিয়াকে সম্ভব করে তুলছে। আজ আমরা অতি সহজে ঘরে বসে সারা দুনিয়ার খবর জানতে পারি। বিশ্বকাপ ফুটবলের খেলা হোক কিংবা ইরাকে মার্কিন হামলা– সবই আমরা টিভির পর্দায় দেখতে পাচ্ছি। আর তা দেখে আমরা প্রতিনিয়ত তাড়িত হই। তাই মিডিয়াকে বাদ দিয়ে বিশ্বায়নকে আলোচনা করলে সেটা একেবারেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আর রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালন ও প্রদর্শনে বিশ্বায়নের ভূমিকায় ইন্টারনেটের অবদান অস্বীকার করার কোনো রাস্তা নেই। (Arba, 2012)। কারণ এ কথা আজ সুপ্রতিষ্ঠিত যে অর্থনীতি, সংস্কৃতি, গণমাধ্যম, বিশ্বায়ন যা-ই আপনি আলোচনা করেন না কেন, তার কেন্দ্র ঘিরে রাখবে কিন্তু রাজনীতি, যা প্রকারান্তে সব ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রকৃত যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে জনগণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। ইন্টারনেট মূলত একটি যোগাযোগের মাধ্যম, যা গতিশীল রাজনীতি এবং যুগপৎভাবে রাজনীতিতে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে সাহায্য ও উদ্বুদ্ধ করেছে। বদ্ধ রাজনীতির দ্বার সাধারণের অংশগ্রহণের ফলে সুগম হয়েছে।

রাজনীতিতে ইন্টারনেটের ভূমিকা

কোনো প্রকার ঝুঁকি না নিয়েই এ কথা স্বীকার করা যায় যে, বিশ্বের ইতিহাসে গণতন্ত্র কখনো পরিজাতক ছিল না। যদিও এখন তার নজির পাওয়া যাচ্ছে আমেরিকা এবং পশ্চিমা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার, সংসদ, রাজনৈতিক দল, রাজনীতিবিদদের কর্মকাণ্ডের ক্রমবর্ধমান বৈধতার ঝুঁকি থেকে। আর সে ঝুঁকি তৈরি করেছে ইন্টারনেট। কারণ ইন্টারনেটকে দেখা হয় স্বাধীনতার চূড়ান্ত কৌশল হিসেবে, যার প্রভাব নাগরিকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্রিয়া করে। কিন্তু বর্তমানে রাজনীতিবিদদের অপ-উপস্থাপন ও অংশগ্রহণ ইন্টারনেটের রাজনৈতিক উপযোগিতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। একই সময়ে সমালোচনাকারীরা গণমাধ্যমের গণতন্ত্র সম্পর্কে সংশয়ও প্রকাশ করছেন। তবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও সুদৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী তাত্ত্বিকের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। (Getle, 2009)। রাজনৈতিক তত্ত্বের অন্যতম বিশ্লেষক বেনজামিন বারবার এ সম্পর্কে বলেন, এটি একটি স্বচ্ছ ধারণার ভূমিকাস্বরূপ।[৭] ১৯৮৪ সালে তার Strong Democracy বইয়ে উল্লেখ করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সম্ভাবনার কথা। এতে বলা হয়েছে, বর্তমান উন্নত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে রাজনীতি সমৃদ্ধ হতে পারে এবং এতে তথ্যের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব আরো সুগঠিত ও সুশৃঙ্খলভাবে। (Microsoft Encata Encyclopedia, 2003)।

রাজনীতিতে ইন্টারনেটের প্রভাব এবং গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশমান পরিবর্তন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে রাজনীতিতে ইন্টারনেটের ভূমিকা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রথমত, আমরা জানি যে ইন্টারনেট হচ্ছে একই সঙ্গে একটি শক্তিশালী ও স্বেচ্ছাচারী মাধ্যম, আবার অনেকের কাছে রাজনৈতিক মাঠ থেকে ফায়দা হাসিলের মাধ্যম। (আহমেদ, ২০১২)। সাধারণ জনগণ সব ধরনের মতাদর্শ একে অপরের সঙ্গে ভাগ করতে বা কোনো মতাদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করতে ইন্টারনেটকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে পছন্দ করে এবং বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনে সরকার, রাজনৈতিক দল এবং গণমানুষ এটি ব্যবহার করে। আবার কারো কারো মতে, তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ ততটা কার্যকর না, যেখানে টাকা দিয়ে ভোট কেনা যায়। এ যুক্তি অবশ্যই গুরুত্বের দাবিদার। কেননা তৃতীয় বিশ্ব বা আমাদের মতো রাষ্ট্রে যেখানে অধিকাংশ মানুষই শিক্ষা ও প্রযুক্তিবঞ্চিত, সেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা খুবই কষ্টকর। অন্তত তার কার্যকর ব্যবহার তো নিশ্চিত করা সত্যিই একটি কঠিন কাজ।

গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে। যে কথাটি একটু আগেই আলোচনা করেছি, রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে থাকে এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ অনেকাংশেই প্রচলিত গণমাধ্যমের ওপর নির্ভর করে, যদিও এটি নিয়ে তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। গণমাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেটের চেয়ে প্রভাবশালী এবং সর্বগ্রাসী মাধ্যম আর নেই। ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রাপ্ত রাজনৈতিক তথ্য সংবাদমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব যুক্ত করেছে। অন্যদিকে এই ঘাটতি সামাজিক বিধানের অস্বচ্ছতা নির্দেশ করে এবং এই পদ্ধতিতে সামাজিক বৈষম্য আরও বেশি বেড়ে চলেছে বলে ধারণা করা হয়। রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আদান-প্রদানে ইন্টারনেটের যে প্রভাব, যদিও সেটা সম্পর্কে আমরা খুব কমই জানি, কিন্তু ধারণা করা যেতে পারে অতীতের যে কোন গণমাধ্যমের চেয়ে তা তুলনাহীনভাবে প্রভাবশালী। কিন্তু সামরিক রাজনীতিতে ইন্টারনেট কী ভূমিকা পালন করে এবং কোন ধরনের নতুন কাঠামো সৃষ্টি করে রাজনৈতিক বিতর্কে তা দেখার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ রয়েছে গবেষকদের। রাজনৈতিক উপস্থাপন ক্ষমতা ও রাজনৈতিক সঠিক সিদ্ধান্ত তৈরিতে ইন্টারনেটের ভূমিকা সম্পর্কে বিমবার মনে করেন, ব্যক্তিক আচরণের চেয়ে ইন্টারনেট অনেক বেশি প্রভাবশালী রাজনৈতিক উপস্থাপন ক্ষমতাসম্পন্ন। তথ্যপ্রবাহের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে রাজনৈতিক কাঠামো ও রাজনৈতিক যে আচরণ, সেটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এখানে। নীতিনির্ধারণ ও পরিবর্তন আনয়নে তথ্যের যে অবাধ প্রবাহ রয়েছে, তা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবহৃত ও সংগঠিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। (Arba, ২০১২)।

Jonathon T. Hunt এর মতে, 'নয়া যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো আরও কার্যকরভাবে জনগণের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করতে পারে এবং এর মাধ্যমেই সমাজে অংশীদারত্বমূলক গণতন্ত্র নিশ্চিত করা যাবে। (Haunt, 2004)। বর্তমান বিশ্বের পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর নিজেদের কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ আরও বাড়ানো, নিজেদের নীতিমালা-কর্মসূচি ও ম্যানিফেস্টো জনগণকে জানানো এবং জনগণের সমর্থন আদায় করার জন্য নয়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেট নিয়ে আসতে পারে যুগান্তকারী পরিবর্তন। ইন্টারনেট হতে পারে ভিন্ন মতাবলম্বী প্রচলিত মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে শ্রমজীবী সাধারণ জনগণের রাজনৈতিক দলগুলোর অন্যতম যোগাযোগীয়

হাতিয়ার। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে জনগণের রাজনৈতিক দলে পরিণত হতে পারে।

এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির এই উন্নয়নের যুগে গোটা বিশ্ব যখন একটি গ্রামের মতো, তখন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাজনৈতিক দল পরিচালনার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট অনেক বড়ো ভূমিকা রাখছে। ফলে গঠনমূলক, সুষম ও গণতন্ত্রের সঠিক রূপ বাস্তবায়নে ইন্টারনেট হতে পারে খুবই উপকারী এবং যথাযথ একটি গণমাধ্যম। অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার রাজনৈতিক অঙ্গনের চেহারা পাল্টে দিতে পারে নিমেষেই। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এই মহাসড়কের কাছেই হয়তো বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকামী রাষ্ট্রগুলো সঠিক গণতন্ত্রের পথ খুঁজে পাবে।

তথ্যসূত্র:

১. আহমেদ, মুসতাক (২০১১); 'বিশ্বায়ন ও গণমাধ্যম: গবেষণার তাত্ত্বিক কাঠামো ও সম্ভাবনা যাচাই', সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল, ১৫দশ সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

২. রশিদ, আমিনুর (২০০৬), 'গণমাধ্যমে বিশ্বায়ন' নিরীক্ষা, ১৫১-১৫২ যুগ্ম সংখ্যা, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ, ঢাকা।

৩. Arba, Sey and Manuel Castells (2006), 'From media politics to networked politics: The internet and the political process', *Journal of Digital Communication*, Sage Publishers.

৪. Crowther, L. (2007), *New information Technology*, Sage Publishers.

৫. Getlel, Gecff. (1969), Politics and political Organization, *Journal of Politiccal Debate,* Vol.4 (2), Sage Publishers.

৬. Hunt, Jonathon T. (2004) *New Information Technology for Democracy*, New Delhi.

৭. Rudolph, Jurgen (2006), "Role of ICT in Politics". *Aldcom*, 7:1, Singapore.

৮. Ward, Stephen (2012), political organizations and the Internet: Towards a Theoretical framework for Analysis, *Journal of Social Network*, Routledge Publishers.

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

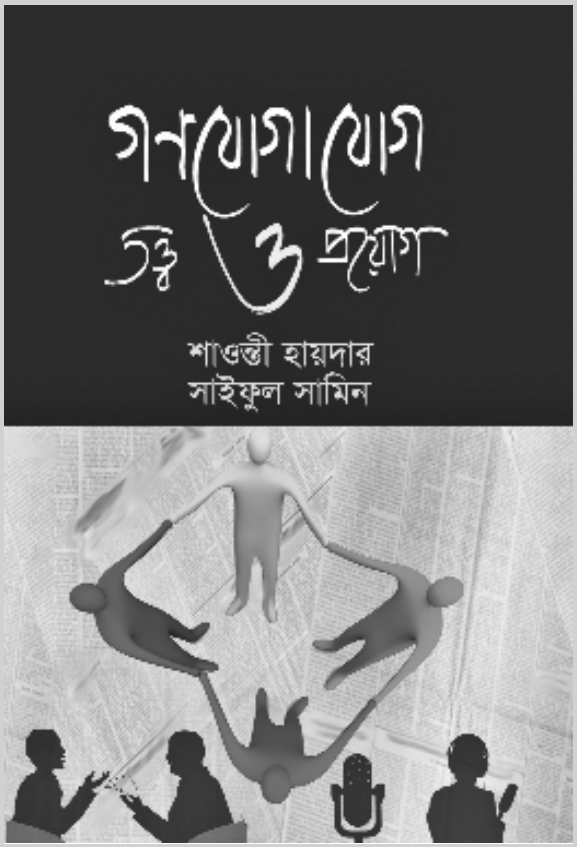

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

নির্বাচন সাংবাদিকতা নিজস্ব অভিজ্ঞতা

প্রণব মজুমদার

সাংবাদিকতা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ পেশা, যদি সেটা হয় প্রত্যক্ষ মাঠপর্যায়ের। মফস্বল সাংবাদিকতা হতে দীর্ঘকালের জাতীয় সাংবাদিকতা পেশায় থেকে তা অনুভব করেছি তীব্রভাবে। পেশাগত জীবনের বেশির ভাগ সময় কাজ করছি আমি অর্থনীতি সাংবাদিকতায়। জাতীয় সাংবাদিকতার শুরু আমার নির্বাচনবিষয়ক ও রাজনৈতিক রিপোর্টিং দিয়ে। দৈনিক আজাদী (চট্টগ্রাম)-এর ঢাকা ব্যুরোতে কাজ করি। স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে আমার কর্ম এলাকা (বিট) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং নির্বাচন। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। আজাদীর ঢাকা ব্যুরোপ্রধান আতিক ভাই (প্রয়াত আতিকুর রহমান) ফেব্রুয়ারির শুরু থেকেই বলছিলেন, 'প্রণব তোমার কিন্তু নির্বাচন কাভার করা লাগবে!' রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বা অন্যান্য স্থানে আওয়ামী লীগের সমাবেশ ও সভার বক্তৃতা শুনি। সাদা ফুলস্কেপ কাগজে খবর লিখতাম। আমার লিখিত খবর খুব একটা আতিক ভাই দেখতেন না। মনে পড়ে শুধু খবরের মুখটা (ইনট্রো) ঠিক আছে কি না, তা তিনি দেখতেন। শিরোনাম দেওয়া হতো না খুব একটা। সে সময়ের আজাদী পত্রিকায় ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে খবর ফ্যাক্সে পাঠানো হতো। সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদের (প্রয়াত) আত্মীয় বাদল তা সংগ্রহ করে ফোনে নিশ্চিত করতেন। তবে খবরের বিষয়ে কথা বলে নিতেন নিউজ এডিটর সাধন ধর (প্রয়াত), সিনিয়র সাংবাদিক কাজী জাফরুল ইসলাম ও নাসিরুল হক।

আজাদীতে চাকরির শুরুতে বিভিন্ন সংগঠনের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এবং তথ্য অধিদপ্তরের 'হ্যান্ডআউট' খবর আকারে তৈরি করা ছিল আমার কাজ। কিছুদিন পর রাজনীতি সংবাদ লেখা মানে আওয়ামী লীগের সভা ও সমাবেশের খবর। এ ছিল আমার কাজের যোগ্যতা। নির্বাচনের খবর লেখা তো ছিল আমার কাছে এক দুঃসাহসিক কাজ। ব্যুরোপ্রধানের নির্দেশ তো অমান্য করা যায় না! নব্বইয়ের আন্দোলন এবং পরের সময়গুলোয় হরতাল ও রাজনৈতিক অন্যান্য কার্যক্রমে সংবাদের উৎস হিসেবে আমার কাছেও তখন ব্যাপক পরিচিত জাতীয় প্রেস ক্লাব। আতিক ভাই সাংবাদিকদের এ বৃহৎ মিলনমেলায়ও সব মহলে বেশ জনপ্রিয়। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রায় ২ সপ্তাহ আগে ক্লাবে যেতে বললেন। বিকালে অফিসে যাওয়ার আগে ক্লাবে গেলাম। পরিচয় করিয়ে দিলেন নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্ট লিখেন এমন ক'জন প্রতিবেদকের সঙ্গে। পরিচিত হলাম দৈনিক পূর্বকোণ (চট্টগ্রাম)-এর ব্যুরোপ্রধান আবু মূসা হাসান ভাইয়ের সঙ্গে। একে একে আমাকে বেসরকারি বার্তা সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ এজেন্সি অব বাংলাদেশের (ইউএনবি) শামীম আহমেদ, রাশেদ চৌধুরী, দৈনিক করতোয়ার (বগুড়া) ঢাকা ব্যুরোর সাইফুল ইসলাম ও মাহমুদুর রহমান খোকনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আতিক ভাই। বললেন, 'এরা আওয়ামী লীগ ও নির্বাচন সংক্রান্ত নিউজ কাভার করে, এদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখো।' প্রায় সবাইকে বললেন আমাকে সহযোগিতা করতে। তারপরও আমার ভয় কাটে না। চোখে-মুখে আমার উৎকণ্ঠা দেখে আতিক ভাই চট্টগ্রাম অফিসকে জানালেন এ ব্যাপারে স্টাফ আইটেম খুব একটা হবে না। নির্বাচনের খবর যেন এজেন্সি অর্থাৎ ইউএনবি এবং বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) থেকে নেওয়া হয়। ভাবলাম বেঁচে

6

১৯৭২ সালের জনগণের উদ্দেশে আইন আদেশের আর্টিকেল ৯৪-এ কী কী আছে, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিধি, এর প্রক্রিয়া, নিবন্ধন ফি এবং দরখাস্তের সঙ্গে কী কী দলিল সংযুক্ত করতে হয়– এসব তথ্য কাগজগুলো থেকে জেনে নিলাম

9

গেলাম! কিন্তু না। নতুন রিপোর্টার, কাজ শিখতে হবে। এমনটা ভেবে তাই আতিক ভাই কাজের আকার সংক্ষেপ করে ১২ দিন আগে শুধু ঢাকা-১১ আসনের (মিরপুর) নির্বাচনের খবর সংগ্রহ করার 'অ্যাসাইনমেন্ট' দিলেন। নির্বাচন ২৭ ফেব্রুয়ারি। নির্বাচন সংক্রান্ত রিপোর্ট করা হতে পারে– এ ভেবে আগে থেকেই খানিকটা প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম।

আতিক ভাই বেশ সহযোগিতাভাবাপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সাংবাদিকতার শুরুতে তিনি দৈনিক পূর্বদেশ এবং বাংলাদেশ অবজারভারে কাজ করেছেন। দৈনিক বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকার ওনার একসময়ের সহকর্মী জাওয়াদুর রহমান (প্রয়াত)। প্রায়ই আসেন রাজধানীর মতিঝিল রহমান ম্যানশনের আজাদীর ঢাকা ব্যুরো অফিসে। ১৯৯১ সালের সে সময়ে বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকার সিনিয়র সহকারী সম্পাদক (একই কাগজের একসময়কার তুখোড় রিপোর্টার ও সাবেক চিফ রিপোর্টার) জাওয়াদুর রহমানের সঙ্গে আতিক ভাই পরিচয় করিয়ে দেন। আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'আমাদের কুমিল্লার ছেলে প্রণব, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করে সবে বেরিয়েছে। খেলাঘর করে ও, আমাদের আজাদীর ঢাকার তরুণ রিপোর্টার।' দুজনেই ঘনঘন কম দামি সিগারেট পান করতেন। আজাদী কার্যালয়ে প্রায় সন্ধ্যায় আসতেন জাওয়াদ ভাই। আমি যেতাম ওনার কর্মস্থল বাংলাদেশ অবজারভার ভবনে। ওনার কাছে রিপোর্টিংয়ের মৌলিক বিষয় এবং রিপোর্টারের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে জেনেছি। পণ্ডিত ওই ব্যক্তির মতে, একজন রিপোর্টার তিনি যে নীতি সমর্থন করেন না কেন, কাজের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। রিপোর্টারের নির্ভীক হওয়া চাই। এ কাজে বেশ ঝুঁকি। সত্য উদ্ঘাটন করে তা লেখা রিপোর্টারের প্রধান দায়িত্ব, তা জেনেছি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সে সময়কার প্রশিক্ষক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক আতিক ভাইয়ের বন্ধু এই জাওয়াদুর রহমানের কাছে। ওনার কাছেই জেনেছি সাংবাদিক ও লেখকদের প্রচুর পড়তে হয়। জানতে হয়। একদিন বললেন, 'দায়িত্ব পালনকালে যা স্পটে দেখবে তা লিখবে। তবে তা হওয়া চাই মানবিক এবং বৃহৎ জনগণের পক্ষে। তা ছাপা হলো কি না, সেটা দেখার বিষয় নয় রিপোর্টারের।' প্রতিবেদকের (রিপোর্টার) দায়িত্ব হচ্ছে সংক্ষেপে যথাযথভাবে প্রতিবেদন তৈরি করা।

প্রেস ক্লাবে যাই, কখনো প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-এর পাঠাগারে। বিভিন্ন সংবাদপত্রের 'ডেইলি ফাইল' দেখি। তাতে প্রকাশিত নির্বাচন সংক্রান্ত খবরগুলো পড়ি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। অনুসরণ করি সংবাদ ও ইত্তেফাকের এ বিষয়ের প্রতিবেদনগুলো। নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি নিয়ে ক্লাবে জ্যেষ্ঠ সহকর্মীদের সঙ্গেও আলোচনা করি। সাহস করে একদিন সকালে আগারগাঁও পরিকল্পনা কমিশনের পাশে নির্বাচন কমিশনে যোগাযোগ করি। নামটা মনে নেই, নির্বাচন কমিশনের একজন সিনিয়র সহকারী সচিব আমাকে নির্বাচন বিধিমালা সম্পর্কে বাংলাদেশ গেজেটের কটি কপি হাতে দিয়ে বললেন, 'এখানে সব নিয়ম পাবেন।' ১৯৭২ সালের জনগণের উদ্দেশে আইন আদেশের আর্টিকেল ৯৪-এ কী কী আছে, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বিধি, এর প্রক্রিয়া, নিবন্ধন ফি এবং দরখাস্তের সঙ্গে কী কী দলিল সংযুক্ত করতে হয়– এসব তথ্য কাগজগুলো থেকে জেনে নিলাম। পরে আরেক দিন গেলাম নির্বাচনি তথ্য সংগ্রহে। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৬ কোটি ২২ লাখ ভোটার, ২ হাজার ৭৭৪ প্রার্থী, সারা দেশে মোট ভোট কেন্দ্র ২৪ হাজার।

মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের প্রতিটি স্তরে আমার পড়াশোনার বিষয় ছিল বাণিজ্য। মফস্বল সাংবাদিকতা দিয়ে এ পেশার শুরু। হিসাববিজ্ঞানে সম্মানসহ স্নাতকোত্তর পাস করে অর্থনৈতিক বিষয়ের সাংবাদিক হব– এ ছিল আমার জীবনের ব্রত। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় সংবাদের বিশিষ্ট সাংবাদিক বজলুর রহমানের (প্রয়াত) লেখা নিয়মিত কলাম 'হালচাল' পড়তাম। দর্শক ছদ্মনামে বজলুর রহমান মানে আমাদের খেলাঘরের ভাইয়া অর্থনীতির ওপর কলামটি লিখতেন। আমিও ছিলাম এর নিয়মিত পাঠক। ওনাকে অনুসরণ করতাম। পরে সে পথেই হেঁটে এসেছি। বাংলা ও ইংরেজি ভাষার ১২টি জাতীয় দৈনিক সংবাদপত্রে রিপোর্টিং বিভাগের অধিকাংশ হাউসেই আমার কর্ম এলাকা বা বিট ছিল অর্থনীতি। তবে বিশেষ কারণে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ অন্য বিট দিলেও তা অবজ্ঞা করতাম না।

নির্বাচন ও জাতীয় সংসদ বিষয়েও রিপোর্টিংয়ে স্বচ্ছন্দবোধ করতাম। কেননা জাতীয় দৈনিকে রিপোর্টার হিসেবে আমার প্রথমদিকের বিষয় ছিল অপরাধ, রাজনীতি ও নির্বাচন।

১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে থেকেই আজাদীতে ব্যতিক্রমধর্মী বিশেষ প্রতিবেদন লিখেছি। ঢাকায় মোট ১৩টি আসন। মোট প্রার্থী ১৮৫ জন। পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে লিখলাম ঢাকা-৬ আসনে সর্বাধিক প্রার্থী ২৬ জন। কম প্রার্থী ঢাকা-১ আসনে। মাত্র ৫ জন। ২৭ ফেব্রুয়ারির এ নির্বাচনে আমার কর্ম-এলাকা ঢাকা-১১ আসন। দৈনিক সংবাদের উত্তরাঞ্চল প্রতিনিধি মোনাজাতউদ্দিন (প্রয়াত)। তৃণমূল সাংবাদিকতায় তিনি এরই মধ্যে বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন। ওনাকে পেলাম মিরপুরের কর্ম-এলাকায়। নির্বাচনের দিনেই প্রথম পরিচয় ওনার সঙ্গে। অনুসরণ করছি ওনাকে। বললাম, 'আমি নবীন, একটু সহযোগিতা করলেই আমি খুশি।' প্রিন্ট ও টিভি অ্যাডের জিঙ্গেল ও পাণ্ডুলিপি লেখার সুবাদে আগে থেকেই পরিচয় ছিল বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাতা ও প্রতিষ্ঠান অ্যাডফাইনের স্বত্বাধিকারী এবং সংবাদের মিরপুর সংবাদদাতা কাজী বেলাল হোসেনের সঙ্গে। মিরপুরের অলিগলি সব এলাকা তাঁর চেনাজানা। উনি দুপুরে যোগ দিলেন মোনজাত ভাইয়ের সঙ্গে। আমরা তিনজন। মোনাজাত ভাই বয়স্ক ও নবীন ভোটারদের ইন্টারভিউ করছেন। পথে পথে বাদাম খাচ্ছেন। আমাদেরও দিচ্ছেন। মনে পড়ছে ঢাকা-১১ আসনে ১৬ জন প্রার্থীর মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ড. কামাল হোসেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ধানের শীষ প্রতীক নিয়ে হারুন রশীদ মোল্লা এবং স্বতন্ত্র হিসেবে ফুলের মালা প্রতীক নিয়ে ড. মো. বদি-উজ-জামান। হারুন রশীদ মোল্লা আওয়ামী লীগের টিকিট না পেয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের হয়ে নির্বাচন করেন। ড. কামালকে নির্বাচনের দিন আমি মাঠে পাইনি। বাকি দুজনকে বিভিন্ন কেন্দ্রের সামনে দেখতে পাই। আগেই এই কর্ম-এলাকা (ঢাকা-১১) নিয়ে 'ঢাকার এক আসনে দুই ডক্টরেট' শিরোনামে রিপোর্ট করেছিলাম। পরে ঢাকার এ নির্বাচন নিয়ে একটি ব্যতিক্রমধর্মী রিপোর্ট করি। ২৯ ফেব্রুয়ারি মহানগরী ঢাকার ৮ আসনে ১৩১ জন প্রার্থীর মধ্যে ১১৫ জনের জামানত বাজেয়াপ্ত শিরোনামে প্রত্যেকের নামসহ আজাদী পত্রিকায় আমার প্রকাশিত রিপোর্টটি পাঠকমহলে প্রশংসিত হয়।

১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ক্ষমতা ছাড়ার পর বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে দেশে গঠিত হয় অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুর রউফের নেতৃত্বে সারা দেশে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনা করে। ৩০০ আসনের বিপরীতে ৪২৪ জন স্বতন্ত্র প্রার্থীসহ ৭৫টি দল থেকে ২ হাজার ৭৮৭ জন প্রার্থী পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেন। মোট ভোট পড়েছিল ৫৫ দশমিক ৪০ শতাংশ। এ নির্বাচনে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ৩০০ আসনের মধ্যে ১৪০টি আসনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। দ্বিতীয় বৃহত্তম দল ছিল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এ দল লাভ করে ৮৮টি আসন। ৫ম জাতীয় নির্বাচনে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত এরশাদ সরকারের দল জাতীয় পার্টি বৃহত্তর রংপুরসহ সারা দেশে ৩৫টি আসন লাভ করে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৮ এবং বাকি ১৯ আসন পায় স্বতন্ত্রসহ অন্যান্য দল।

একদিন রাতে কাজ শেষে বাসায় ফিরছি। আতিক ভাই বললেন, উপনির্বাচনের জন্যও তৈরি হও। আজাদী পত্রিকা তখন চট্টগ্রামে সর্বাধিক বিক্রীত দৈনিক সংবাদপত্র। নির্বাচন-উত্তর চট্টগ্রামের রাজনৈতিক হালচাল নিয়ে থানা পর্যায়ের মানুষের ভাবনা বিষয়ে প্রতিদিন ধারাবাহিক সংবাদ ছাপা হচ্ছিল। সে কারণে আমাকে উপনির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহ নিয়ে ভাবতে হলো না।

১৯৯৫ সালের শেষে দৈনিক আজাদী ছেড়ে চলে আসি দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকায়। বিট অর্থনীতি। চাকরির শুরুতে ব্যাংকের ঋণখেলাপি, সার্ভিসের ইংরেজি স্লাগ, প্রেস রিলিজ এবং সেমিনার বিষয়ের নিয়মিত অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। ১৯৯৬ সালে মে থেকেই মহানগরীর তেজগাঁও তিব্বতের কাছে বাংলা বাজার পত্রিকা অফিসে নির্বাচনি আমেজ। পত্রিকা প্রকাশকের সাবান কারখানার ওপরে অফিস। সাবানের কাঁচামালের গন্ধ সারাক্ষণ থাকলেও প্রার্থীদের আসা-যাওয়ার কমতি ছিল না। রাজনৈতিক নেতারা ইন্টারভিউ দিতে আসেন। বাংলা বাজার পত্রিকা যেন নির্বাচনি মুখপত্র। একসময়কার ডাকসাইটে রিপোর্টার মতিউর রহমান চৌধুরী বাংলা বাজার পত্রিকার সম্পাদক। দুদিন পরপর রিপোর্টারদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। ১৮ জন রিপোর্টারের প্রায় সবারই অ্যাসাইনমেন্ট নির্বাচনকেন্দ্রিক। কাজ শেষে একদিন রাতে মতি ভাইকে বললাম, যেসব প্রার্থী ব্যাংক ঋণ নিয়েছেন তাদের তো পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে? কিন্তু সম্পাদকের নির্দেশ– দুদিকের রিপোর্টই করতে হবে। মতি ভাই নজর রাখতেন সপ্তাহে প্রত্যেক রিপোর্টার ২টি বিশেষ প্রতিবেদন জমা দেন কি না। বার্তা সম্পাদক আহমেদ ফারুক হাসানকে (প্রয়াত) তার রুমে ডেকে বললেন, আমাকে যেন বেশি নির্বাচনের ওপর বড়ো বড়ো অ্যাসানইমেন্ট দেওয়া হয়। বেশ চাপের মধ্যে রাখলেন আমায়। সকাল থেকে দুপুর অবধি মতিঝিল ব্যাংকপাড়া অথবা নির্বাচনি এলাকায়। বিকাল ৪টার মধ্যে অফিসে থাকা। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ব্যাংকপাড়ার খবর সংগ্রহের জন্য আমার কোনো ডে-অফ নেই। কাজের অতিরিক্ত চাপে নিজের অর্থায়নে রাতের খাবার গ্রহণ করি অফিসে।

ঢাকা-৩ (কেরানীগঞ্জ) আসনটি বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। এ এলাকায় ভাঙচুর ও মারামারি লেগেই থাকে। নির্বাচনের ভোটের হাওয়া ধারাবাহিকের এ পর্বের রিপোর্টার আমি। ১১টি ইউনিয়নের ৩৯৯টি গ্রাম নিয়ে কেরানীগঞ্জের বিশাল নির্বাচনি এলাকা। জিঞ্জিরা ইউনিয়নে বাঘা বাঘা নেতা। আওয়ামী যুবলীগের নেতা মোস্তফা মহসীন মন্টু। সম্প্রতি গণফোরামে যোগ দিয়েছেন। জনপ্রিয় হলেও তিনি প্রার্থী হননি। বিএনপি নেতা ও ডাকসুর সাবেক ভিপি ও এমপি আমানউল্লাহ আমান ও জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক এমপি সাইফুর রহমান এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মো. শাহজাহানসহ ১১ জন প্রার্থী এ আসনে। ২ দিন ঘুরে ভোটারদের সঙ্গে কথা বললাম। সরেজমিন প্রতিবেদন। রিপোর্টটি প্রকাশের পর অনেক ফোন পেয়েছিলেন মতি ভাই।

১২ জুন বৃহস্পতিবার সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। আগেই মতি ভাই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন কোন রিপোর্টারকে কোন এলাকায় পাঠাবেন। রোববার সকালে রিপোর্টারদের সঙ্গে সম্পাদক মহোদয়ের রুমে নির্ধারিত সভা। মতি ভাইয়ের কক্ষে ৯ জুন রোববারের সভায় সকালে ফারুক ও কাদির ভাই এবং রিপোর্টাররা উপস্থিত। মতি ভাই সিদ্ধান্ত নিলেন নির্বাচনের খবর সংগ্রহের জন্য ঢাকার বাইরে ক'জন রিপোর্টার পাঠাবেন। সন্ত্রাসের জনপদ বলে খ্যাত ফেনীর নির্বাচনি এলাকায় রিপোর্টার পাঠাবেন। কিন্তু ভয়ে কোনো রিপোর্টারই সে অঞ্চলে যেতে চাচ্ছেন না। মতি ভাই আমাকে বিশেষ অনুরোধ করলেন। ফারুক সায় দিল মতি ভাইয়ের কথায়। বলল, ও পারবে মতি ভাই। ফেনীর ৩টি আসনে সাংবাদিক হিসেবে নির্বাচনের তথ্য সংগ্রহের জন্য ফারুক প্রতিষ্ঠানের প্যাডে জেলা প্রশাসকের কাছে চিঠি লিখলেন। যানবাহন, যাতায়াত, থাকা ও খাওয়ার জন্য ৭ দিনের ফেনী সফর। অফিসের হিসাব বিভাগ থেকে অগ্রিম বাবদ আমাকে দেওয়া হলো ৪ হাজার ৫০০ টাকা।

১০ তারিখ বিকালে সায়েদাবাদ থেকে ফেনীর উদ্দেশে রওনা হয়ে যাই। রাত সাড়ে ৮টায় বাস পৌঁছে ফেনীর মহিপাল মোড়ে। মফস্বল সম্পাদক মো. আবদুল কুদ্দুস ভাই

বাংলা বাজার পত্রিকার ফেনী সংবাদদাতা মাহফুজুল হক ভাইকে আমার ফেনী যাওয়ার কথা ফোনে জানিয়েছিলেন। মহিপাল মোড় থেকে রিকশায় উঠলাম। রিকশাওয়ালাকে বললাম, কম দামের আবাসিক হোটেলে নিয়ে যেতে। পাইলট স্কুলের সামনে নামিয়ে দিল রিকশাওয়ালা। সামনেই ৪ তলা মার্কেট। নিচে খাবার হোটেল। রাতের আহার শেষে স্টেশন রোডের একটি অখ্যাত আবাসিক হোটেল ইদ্রিসিয়ায় উঠি। অখ্যাত হোটেল নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমার কৌশল ছিল সন্ত্রাসী কেউ যেন আমার অবস্থান জানতে না পারে। অচেনা স্থানে কাজের ঝুঁকি অনেক। আমাকে অফিস ৭ দিনের জন্য পাঠিয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে এখান থেকে ভালো-মন্দ সব ধরনের রিপোর্ট করতে হবে। মাহফুজ ভাইয়ের মাধ্যমে হাজারীর আশীর্বাদপুষ্ট লোকজন এবং স্থানীয় সাংবাদিকরা জেনে গেছে আমি ফেনীতে আসছি।

পরদিন সকালে গেলাম মাহফুজ ভাইয়ের বাসায়। তিনি বললেন, চলেন হাজারী ভাইয়ের বাড়ি। মাহফুজ ভাইকে নিয়ে বিকালে গেলাম হাজারীর বাড়ি। বাংলো আকৃতির বাড়ি তার। শহরের মাস্টারপাড়া। বাড়ির সামনে টেনিস কোর্ট। ক্রীড়ামোদি তিনি। লং টেনিস খেলছিলেন। দৈনিক সংবাদের ফেনী সংবাদদাতা বিধান মজুমদার সুমন জয়নাল আবেদীন হাজারীর সাপ্তাহিক পত্রিকা হাজারিকার নির্বাহী সম্পাদক। তোয়ালে দিয়ে ঘাম মুছে বললেন, 'সুমন সাংবাদিক সাহেবদের ড্রয়িং রুমে নিয়ে বসাও, আমি আসছি।' সুমন বিস্কুট, চানাচুর ও পানীয় স্প্রাইট দিয়ে আমাদের আপ্যায়ন করালেন। মাথায় ক্যাপ পরা অকৃতদার জয়নাল আবেদীন হাজারী রুমে ঢুকে বললেন, 'আপনারা খেয়েছেন কিছু?' হাজারী সাহেব বললেন, সাংবাদিক সাহেব আমার বাড়িতে বেড়ান। ঢাকা থেকে কষ্ট করে এসেছেন। তার বাংলোয় থেকে কাজ করার জন্য অনুরোধ করলেন। আগের রাতে ইদ্রিসিয়ায় ৪০ টাকা মূল্যের সিটে ছারপোকার কামড় খেয়েছি, সেই কষ্টের কথা মনে মনেই রাখলাম। কোথায় উঠেছি, তা বলেছি শুধু মাহফুজ ভাইকে। আমার অবস্থান যেন কেউ না জানে, সেটা মাহফুজ ভাইকে জানিয়েছিলাম। মাহফুজ ভাই হাজারী সাহেবকে বললেন, আমার বাসায় উঠেছেন তিনি। আমি বললাম, থাকা ও খাওয়ার ব্যাপারে কোনো অসুবিধা হলে আপনাকে জানাব হাজারী ভাই। আজ আসি। বিদায় নিলাম। বিধান মজুমদার সুমন ও তার সহযোগীদের হাজারী বললেন আমাকে দেখে রাখতে। সুমন ও তার লোকজন আমার পিছু ছাড়ছে না। বললাম, লিডারকে বলবেন, আমি আপনাদের লোক, কোনো সমস্যা নেই। মাহফুজ ভাইয়ের বাসায় গিয়ে কিছুক্ষণ থেকে ওইদিন আর হোটেলে গেলাম না! পরদিন সকালে শহরের পলিটেকনিক রোডে নতুন রাস্তায় অবস্থিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উপস্থিত হই। জেলা প্রশাসক নূর মোহাম্মদ অফিসের চিঠিটি দেখে ফেনীর ৩টি আসনে নির্বাচনি দায়িত্ব পালনের জন্য হাতে পাস ধরিয়ে দিলেন। সেখানেই পরিচয় হয় দৈনিক বাংলার ফেনী প্রতিনিধি শাহজালাল রতনের সঙ্গে। তিনি হাজারীর কর্মকাণ্ডকে অপছন্দ করেন। অভয় দিয়ে বললেন, কোনো ভয় নেই, আমার হোন্ডা আছে। আপনি চাইলে আমার সঙ্গে থাকতে পারেন। ভাবলাম কেন্দ্রগুলো চিনি না। বললাম, নির্বাচন তথ্য সংগ্রহের কাজে আপনার সহযোগিতা চাই রতন ভাই। বললেন, ভোরে প্রস্তুত থাকবেন। ওইদিন শহীদ শহীদুল্লা কায়সার সড়কে আমার পরিচিত এক শিক্ষকের বাসায় তিনি আমায় পৌঁছে দিলেন। রাত কাটালাম সেখানে। পরদিন অর্থাৎ ১২ জুন ভোরে রতন ভাই তার হোন্ডা নিয়ে হাজির। শিক্ষক ভদ্রলোকের বাসা থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। যাব ফেনী-৩ আসনের বিভিন্ন কেন্দ্রে। সোজা লালপুল। সেখানে একটি হোটেলে খাওয়া-দাওয়া শেষে মোটরসাইকেলে দুজনের সোনাগাজী যাত্রা। পথে একটি ভোট কেন্দ্রে দেখতে পেলাম এক পক্ষ প্রতিপক্ষের লোকজনদের লাঠি-বল্লম নিয়ে নিয়ে তাড়া করছে। রতন ভাই বললেন, ভয় পাবেন না দাদা। ওরা আমাদের কিছু করবে না। যারা তাড়া করছে তারা মোশাররফের লোক। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র আহমেদপুর ও আমিরাবাদ। বেলা সোয়া ১২টা অবধি থেকে মারামারি ও ব্যালেট পেপার ছিনিয়ে নেয়া এসব দৃশ্য দেখে চলে আসি ফেনী শহরে। ফেনী শহরে আসনটি হচ্ছে ফেনী-২। ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী জয়নাল আবেদীন হাজারীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। পাইলট স্কুল কেন্দ্রের সামনে বাঁশ দিয়ে বানানো পথে সুমন ও তার লোকজন দাঁড়ানো। বললাম, 'সুমন আপনিও চলেন।' সুমন গেল না। সাহস করে নির্বাচনি ডিউটি পাস দেখিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। কেন্দ্র থেকে বেরিয়ে পথে বিস্কুট কলা এবং চা পান শেষে ফেনী-১ আসনের মূল কেন্দ্র ফুলগাজী যাত্রা। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নির্বাচনি এলাকা। তাই উৎসাহ বেশি। ফুলগাজী, মুন্সীরহাট, দরবারপুর ও বক্স মোহাম্মদ– কটি কেন্দ্র হয়ে ফিরে আসি দুজন। দুপুরে কেন্দ্রগুলোয় তেমন অনিয়ম চোখে পড়ল না। ভোটারদের উপস্থিতি কম।

পরশুরাম যাবেন? বললেন রতন ভাই। প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে ঘর্মাক্ত আমরা। আমার অনাগ্রহ। ফেনী শহরে ফিরে আসি। পথে আনন্দপুর কেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করে শহরে পৌঁছি, তখন বিকাল সোয়া ৫টা। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে দেখি ফেনীর অনেক সাংবাদিক নির্বাচনি খবরের জন্য অপেক্ষায়। এর মধ্যে সন্ধ্যায় খবর এলো নির্বাচনি সংঘর্ষে সোনাগাজীর আহমেদপুর গ্রামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। তাকে প্রতিপক্ষরা গুলি করে। লাশ ফেনী সদর হাসপাতালে। দুজন ছুটলাম সেদিকে। অনেক কষ্টে নাম সংগ্রহ করলাম। মৃত ব্যক্তির নাম মোস্তফা কামাল। বয়স ২৮। রতন ভাইকে বললাম, সারা দিন যা পেয়েছি, সে তথ্য নিউজ করার জন্য পর্যাপ্ত নয়। আপনি কোরেশী ও হাজারীর নির্বাচনি প্রচার কেন্দ্রে গিয়ে ঘুরে আসুন। আমি ডিসি সাহেবের অফিসে থাকি। ৩৫ মিনিট পর রতন ভাই এলেন নানা খবর নিয়ে। ফেনী ৩টি আসনের ২৩৬টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে ফেনী-২ ও ৩ আসনের ২টি কেন্দ্রে স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। সোনাগাজীর বিভিন্ন কেন্দ্রে নির্বাচনি সংঘর্ষে আহতদের নাম হাসপাতাল থেকে আগেই সংগ্রহ করে এনেছিলাম। ডিসি অফিসের ফ্যাক্স থেকে অনেকেই ঢাকায় নিউজ পাঠান। শহরে মাত্র ২টি ফ্যাক্সের দোকান। রতন ভাই বললেন, আমরা এখান থেকেই খবর পাঠাব, আপনি লিখে ফেলুন। ডিসি অফিসের পিয়ন থেকে লম্বা সাদা কাগজ নিলাম। স্থানীয় আরও অনেক সংবাদদাতাও কাগজ নিলেন; কিন্তু লিখছেন না। সুদর্শন তরুণ দৈনিক ইত্তেফাকের সংবাদদাতা। তিনি বললেন, 'আপনি আমায় দেখাবেন কিন্তু, কীভাবে শুরু করব, ভেবে পাচ্ছি না।' প্রায় সবাই আমার রিপোর্ট নকল করতে শুরু করলেন। লেখা শেষ করলাম; কিন্তু পাঠাব কী করে? ডিসি সাহেবের ফ্যাক্স বিকল হয়ে গেছে! দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম! রাত ৮টার আগেই রিপোর্ট পাঠাতে হবে। হতাশ হয়ে রতন ভাইকে বললাম, বিকল্প কী ব্যবস্থা? শহীদুল্লা কায়সার সড়কের মোড় এবং মহিপালে ফ্যাক্সের দোকান আছে, ভয় কীসের? তিনি আমায় আশ্বস্ত করলেন। হোন্ডায় যেতে যেতে বললেন, আমি টিএন্ডটি থেকে টেলিগ্রামে খবর পাঠাই। মূল শহর থেকে মহিপাল যাওয়ার পথে শহিদ শহীদুল্লা কায়সার সড়কের মোড়। দোকানে দেখি সাংবাদিকদের ভিড় বেশ। কারো ফ্যাক্সই যাচ্ছে না। প্রতি পাতা ৩০ টাকা। বললাম, 'ভাই চেষ্টা করে দেখুন আমারটা!' ফুলস্কেপ সাদা কাগজে লেখা ২ পাতায় লেখা খবরটি পাঠানো হলো। প্রথম পাতায় মূল খবর। দ্বিতীয় পাতায় নির্বাচনি ঘটনার বিবরণ। ফ্যাক্স মেশিন থেকে বার্তা পাঠানোর নিশ্চিতকরণ মিহি কাগজে 'রিপোর্ট' এলো 'এরর'। ফেনী থেকে সেদিন কোনো সাংবাদিক নিউজ পাঠাতে পারেননি শুধু আমি এবং শাহজালাল রতন ছাড়া। বাংলাদেশ টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ বোর্ড অফিসে গিয়ে রতন ভাই তার দৈনিক বাংলা পত্রিকায় সংক্ষেপে নিউজের টেলিগ্রাম বার্তা পাঠালেন। আর আমি বাংলা বাজার পত্রিকায় নিউজ এডিটর ফারুককে ফোনে তথ্য দিলাম।

ফেনীতে এ নির্বাচনি তথ্য সংগ্রহ করার জন্য আমিই ছিলাম ঢাকা থেকে আসা একমাত্র সাংবাদিক। এখানে বাংলা বাজার পত্রিকার জনপ্রিয়তা মন্দ নয়। ঢাকা থেকে কোনো জাতীয় দৈনিকের বিশেষ প্রতিনিধি এসে ক'দিন রিপোর্ট করায় নির্বাচনের আগে ও পরে বাংলা বাজার পত্রিকা বেশ বিক্রি হয়! ৫ দিনের জন্য হোটেল ইদ্রিসিয়া রুম ভাড়া অগ্রিম দেওয়া ছিল। অনিরাপদ মনে হওয়ায় নির্বাচনের দিন হোটেলে থাকিনি। ছিলাম মহিপালে। সকাল ৮টায় বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দেখি হরতাল পালিত হচ্ছে না। বাংলা বাজার পত্রিকা বেশ বিক্রি হচ্ছে। আমিও কিনে নিয়েছি একটা। প্রথম পাতায় ওপরে ডানে ২ কলামে আমার প্রকাশিত রিপোর্ট– ফেনীতে তিনটি আসনেই সংঘর্ষ, নিহত ১, ফেনী থেকে প্রণব মজুমদার। আশ্চর্য হলাম এই ভেবে– ফ্যাক্স রিপোর্ট এলো 'এরর', অথচ আমার পাঠানো প্রথম পাতার রিপোর্টের হুবহু লেখা ছাপার অক্ষরে। অন্য দৈনিকগুলোয় লক্ষ করলাম ফেনীর নির্বাচন সংক্রান্ত খবর নেই! স্টেশন রোডের রেলগেট থেকে টেম্পুতে সকালে ছাগলনাইয়ায় পরিচিত এক বাড়িতে বেড়িয়ে আসি। দুপুরের খাওয়া সেখানে সেরেই চলে আসি শহরে। শহরে বোমাবাজি হচ্ছিল। যোগাযোগ করি সংবাদদাতা মাহফুজুল হক (প্রয়াত) ভাইয়ের সঙ্গে। তিনি সংবাদ পেয়েছেন ফেনী-৩ আসনের লেমুয়া বাজার এলাকা থেকে বিডিআর সদস্যরা ২১৩টি কালো বোরকা, ১ লাখ ১০ হাজার ১০০ টাকাসহ একটি টেম্পু থেকে ৫ ব্যক্তিকে আটক করেছে। ফেনী থানায় গিয়ে নিশ্চিত হলাম খবরটির। নিজ থেকেই আগের দিন পাঠানো রিপোর্টের ১ পাতার টাকা পরিশোধ করলাম ফ্যাক্স দোকানিকে। শহিদ শহীদুল্লা কায়সার সড়কের মোড়ের সেই দোকান থেকেই সন্ধ্যায় ফ্যাক্সে পাঠালাম দুজনের নামে লিখিত রিপোর্ট– শোল্ডার হেডিং– '২১৩টি বোরকাসহ লক্ষাধিক টাকাসহ ৫ ব্যক্তি আটক, ফেনীতে হরতাল হয়নি, বোমাবাজি, ভাঙচুর'। শহরের গুদাম কোয়ার্টার ও লালপুলে অবস্থান করে রিপোর্ট করি। ছাপা হয় আমার পাঠানো রিপোর্ট। বাংলা বাজার পত্রিকার বেশ কাটতি! নির্বাচনি অন্যান্য বিষয়ে আরও ৪টি রিপোর্ট করি ফেনীতে থেকেই। ভাগ্য ভালো, সেলফোনের যুগ ছিল না। না হলে আমার অবস্থা শোচনীয় হতে পারত! মারধরের দুশ্চিন্তা! কী জানি কখন কী হয়ে যায়! কিন্তু দায়িত্ব পালন থেকে মোটেও পিছপা হইনি আমি। ১৫ জুন রাতে হোটেলে থেকে পরদিন খুব সকালে ফেনী থেকে রওনা দিয়ে ঢাকায় ফিরে আসি দুপুরে। ওইদিন আর অফিসে যাইনি। পরের দিন সন্ধ্যায় অফিসে অনেকেই আমার সাহসিক কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। বর্ষীয়ান একজন টেবিল (ডেস্ক) সম্পাদকের প্রশংসাসূচক সংলাপ!

৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ১৪৬টি আসন পেয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এককভাবে সরকার গঠন করে। প্রতিবেদক হিসেবে আমার জীবনে এ নির্বাচন ছিল তৃণমূল পর্যায়ে সরেজমিন সাংবাদিকতার এক দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতা।

আজকের কাগজে অর্থনৈতিক প্রতিবেদক থাকা সত্ত্বেও ২০০১ সালের ৮ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমারও নির্বাচন কাজের দায়িত্ব ছিল। দিনের বেলা নির্বাচন কমিশনে 'ডিউটি'। মনে পড়ে ২০০১ সালের ১ অক্টোবর আজকের কাগজের সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমেদ প্রতিবেদক অনেককেই সারা রাত কাজ করিয়েছিলেন। নির্বাচন কমিশন থেকে ফ্যাক্সে প্রাপ্ত নির্বাচনি সংবাদ সম্পাদনা ও তদারকির দায়িত্বে ছিলাম আমিও সেই রাতে। মহানগরীর তেজগাঁও আরজতপাড়ার মীনা হাউসের দোতলার ক্যান্টিন সারা রাত খোলা রাখা হয়েছিল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্বচ্ছ কাচের মোড়কে আবদ্ধ কক্ষে হিমেল হাওয়ায় শরীরে থাকা জ্বর ক্রমশই বাড়ছিল। শীতে কাঁপছিলাম। সেদিন আমার সাপ্তাহিক ছুটিও ছিল। কিন্তু প্রধান প্রতিবেদক মেজবাহ আহমেদ বলেছিলেন, স্যারের (কাজী শাহেদ আহমেদ) নির্দেশ 'কোনো রিপোর্টারকে ছুটি দেওয়া যাবে না।' ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় কাজ করি। ভাবলাম– 'ডিউটি ইজ ডিউটি।'

লেখক: সাহিত্যিক ও দৈনিক শিরোনাম (কুমিল্লা)-র ঢাকা ব্যুরোপ্রধান ও সাপ্তাহিক অর্থকাগজ-এর সম্পাদক

দায়িত্বশীল গণমাধ্যম
গণতন্ত্র, নির্বাচন ও
নির্বাচনি প্রচারণার
নিয়ামক শক্তি

শাহ্ শেখ মজলিশ ফুয়াদ

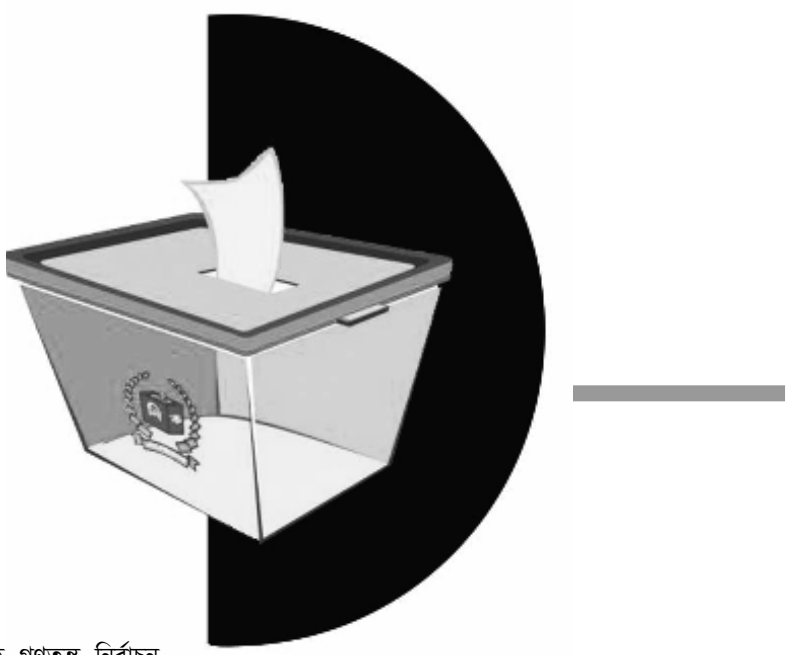

ঐতিহ্যগত ও ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে রাজনীতি, গণতন্ত্র, নির্বাচন, সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যম– এ শব্দগুলো একে অপরের খুবই প্রাসঙ্গিক। সাম্প্রতিক সময়ে গণমাধ্যম বলতে যে জগৎটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক মাধ্যমকে (ইলেকট্রনিক মিডিয়া) বোঝানো হলেও এদেশে রাজনীতি এবং নির্বাচনের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সংবাদপত্রের ইতিহাস। ১৯৩৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত এদেশের রাজনীতি ও নির্বাচনের ৮০ বছরেরও বেশি সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ সময়ে যারা এদেশের গণমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে রাজনীতি ও নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই তাঁদের নিজ নিজ আদর্শ প্রচারে সংবাদপত্র প্রকাশনার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। এক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইসলাম (নবযুগ), মওলানা আকরম খাঁ (দৈনিক আজাদ), শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক (নবযুগ), হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (দৈনিক ইত্তেহাদ), হামিদুল হক চৌধুরী (পাকিস্তান অবজারভার), মওলানা ভাসানী (দৈনিক ইত্তেফাক), আবুল মনসুর আহমদ (দৈনিক ইত্তেহাদ), তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া (দৈনিক ইত্তেফাক), খায়রুল কবীর ও আহমেদুল কবীর (দৈনিক সংবাদ) এবং সর্বোপরি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (দৈনিক ইত্তেহাদ ও দৈনিক ইত্তেফাক) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের উদ্যোগে প্রকাশিত ও সম্পাদিত সংবাদপত্র নবযুগ, আজাদ, ইত্তেহাদ, ইত্তেফাক ও সংবাদ সেই ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি আমলে এদেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে ঘুম থেকে জাগ্রত ও সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছিল, যা এদেশের রাজনীতি ও গণমাধ্যম তথা সাংবাদিকতার ইতিহাসেরও এক অবিচ্ছেদ্য অংশ।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়েও এখন নিশ্চিত কোনো কথা বলা যায় না। 'মিডিয়া-ক্যু' নামের একটি শব্দ একসময় খুবই পরিচিতি পেয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সময় পাল্টে গেছে। বাংলাদেশের সংবাদপত্র তথা গণমাধ্যম অতি সাধারণ মানুষের কাছে যা অতি সহজেই মিডিয়া নামে পরিচিতি পেয়েছে। মিডিয়া বিশেষ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রচার ও প্রসার এখন দেশে আগের তুলনায় শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, জনগণের কাছে সহজলভ্য হয়েছে। তাই নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে মিডিয়ার প্রতি জনগণের চোখও তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের প্রকৃতির মতোই এই জনপদের মানুষ যে কত সহজ ও

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সারা দেশে এখন থেকেই যে সাজ সাজ রব উঠেছে, তা একমাত্র গণমাধ্যমের কল্যাণেই। ... সে ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো ভাষ্য দেওয়া না গেলেও এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে বর্তমানে নির্বাচন ও গণমাধ্যম পরস্পর অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরশীল ও প্রাসঙ্গিক

সরল, তার একটি প্রমাণই হচ্ছে এদেশের মানুষ নির্বাচনপাগল। যখনই নির্বাচন আসে, তখনই মানুষ নতুন করে মেতে উঠে নির্বাচন নিয়ে। নির্বাচন এখানে উৎসবে পরিণত হয়। স্থানীয়, জাতীয়, প্রাতিষ্ঠানিক– যে কোনো নির্বাচনেই মানুষ আজ অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আগে থেকেই দেশের জাতীয় ও আঞ্চলিক সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে সারা দেশে বিভিন্ন নির্বাচনি এলাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সম্ভাব্য প্রার্থীদের অবস্থান নিয়ে যেভাবে জরিপ, জল্পনা-কল্পনা, লেখালেখি, জনসংযোগ, অনুষ্ঠান চলছে, তার নজির পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে আছে কি না জানা নেই।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সারা দেশে এখন থেকেই যে সাজ সাজ রব উঠেছে, তা একমাত্র গণমাধ্যমের কল্যাণেই। বর্তমান গণমাধ্যমে সাধারণ মানুষের স্বার্থ প্রকৃত অর্থেই কতটুকু ব্যবহার হচ্ছে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো ভাষ্য দেওয়া না গেলেও এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে বর্তমানে নির্বাচন ও গণমাধ্যম পরস্পর অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভরশীল ও প্রাসঙ্গিক। পত্রপত্রিকা ও বৈদ্যুতিক মাধ্যমগুলোয় সারা দেশের নির্বাচনি আসনভিত্তিক সম্ভাব্য প্রার্থীদের পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে। খবর এবং টকশোগুলোয় নির্বাচনের কথা, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী ও দলের অবস্থান তুলে ধরা হচ্ছে বিস্তারিতভাবে। এতে গণমাধ্যমের সঙ্গে জনগণের একটি বিরাট আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তবে নির্বাচনি বৈতরণি পার হওয়ার পর নির্বাচিত সবাই গণমানুষের স্বার্থের দিকটি তাদের চিন্তা-চেতনায় যতটুকু রাখতে পারবেন, দেশ ও দেশের জনগণের মঙ্গল চিন্তকদের কাছে সেটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এদেশে নির্বাচনের মাধ্যমে সমাজের নেতৃত্ব লাভের সংস্কৃতি তথা সুযোগের ইতিহাস বেশি দিন আগের কথা নয়। ইংরেজ আমলে এদেশের অধিকাংশ মানুষ ছিল তাদের নিয়ন্ত্রিত জমিদারদের প্রজা। জমিদারদের খাজনা পরিশোধ করতে করতেই প্রজাদের জীবন তখন অতীষ্ঠ হতো। প্রজার আবার কীসের ভোটাধিকার? কীসের সুযোগ? প্রখ্যাত রাজনীতিক-সাংবাদিক-সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৭-১৯৭৯) 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর', তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার (১৯১১-১৯৬৯) 'পাকিস্তানী রাজনীতির বিশ বছর', জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (১৯২০-১৯৭৫) 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং তাজউদ্দিন আহমদের (১৯২৫-১৯৭৫) 'ডায়েরী' মনোযোগ দিয়ে পড়লে বোঝা যায়, সমাজ ও দেশের কল্যাণে রাজনীতি করা তখন কত কঠিন ছিল! এদেশের মানুষের সর্বাঙ্গীণ রাজনৈতিক মুক্তি ও কল্যাণ কামনায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মতো রাজনীতিবিদ তখন কী কঠিন সংগ্রাম করে গেছেন আজীবন।

স্বাধীনতা অর্জনের ৪৭ বছর পর আজ এ কথা স্পষ্ট করেই দাবি করা যায় যে, নির্বাচন ও গণতন্ত্রের বদৌলতে এ দেশ ও দেশের মানুষ অনেক কিছু পেয়েছে, বিশেষ করে অর্জন করেছে অভাবনীয় অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি। বিভিন্ন সময়ে শুধু বন্দুকের নলের জোরে যারা ক্ষমতায় এসেছিল, তাদের কথা বাদ দিলেও জনগণের ভোটের মধ্য দিয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কারো কারো অদূরদর্শিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে দেশে আজও অর্জিত হয়নি জনগণের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি। আজও দেশে জিইয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন সমস্যা, নির্বাচন নিয়ে মানুষের মধ্যে বিরাজ করছে উত্তেজনা ও অস্বস্তি। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান '৭১-এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, '১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই।' এর ধারাবাহিকতায় এদেশের নিপীড়িত ও বঞ্চিত জনগণের বহু কাঙ্ক্ষিত ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে মওলানা ভাসানীর দল অংশগ্রহণ না করায় তারা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একচ্ছত্র রায় দেয় আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে। ওই নির্বাচনের ফলই বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করে দেয়। বঙ্গবন্ধু পেয়ে যান গণমানুষের ম্যান্ডেট। প্রেক্ষাপট তৈরি হয় ৭ই মার্চের জনসভার ভাষণের। সেই থেকে বাঙালি জাতি, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু– এই শব্দগুলো প্রায় সমার্থক হয়ে যায়।

বঙ্গবন্ধুর সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা, বিচক্ষণতা ও জাতির প্রতি তাঁর আজীবনের অঙ্গীকারের ফলে বাঙালি জাতির ভাগ্য এতটাই সুপ্রসন্ন যে, '৭০-এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু তাঁর দলকে নিরঙ্কুশ বিজয়ী করতে পেরেছিলেন। অপরদিকে '৭০-এ 'নির্বাচনের খেলা খেলে লাভ হয় নাই, কোনো কালে'– এসব স্লোগান দিয়ে নির্বাচন বর্জনকারীরা প্রকৃতপক্ষে দেশের সার্বিক কল্যাণে কী ভূমিকা রেখে গেছেন, তা নিয়েও গভীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে। কারণ ওই নির্বাচন বর্জনকারী মওলানা ভাসানীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সম্পর্ক কী ছিল, তা আজও গভীর অনুসন্ধানের বিষয় হয়ে রয়েছে। ইতিহাসের সত্য হচ্ছে, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর মুক্তিলাভ এবং মুক্তির পর পরই মওলানা ভাসানীর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের কয়েক ঘণ্টার একান্ত বৈঠকের ছোট্ট একটি খবর তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলেও তাঁদের মধ্যে কী কথা হয়েছিল, তা আজও অপ্রকাশিত।

নির্বাচন বর্জনে সেকাল আর একালের পরিস্থিতি এক নয়। নির্বাচনে অংশ না নিলে নির্বাচনপাগল এদেশের মানুষের জন্য রাজনীতি করা, তাদের সঙ্গে মিশে থাকা, রাজনীতিতে টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়ে। আজ এ কথা অতি সহজেই বলা যায় যে, এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এদেশে রাজনীতিতে, জনগণের কাছে আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বর্তমানে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও প্রাসঙ্গিক হয়ে বিরাজমান রয়েছে এবং আছে শুধু প্রতিটি জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার মধ্য থেকেই। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায় দেশের নির্বাচন তথা গণতান্ত্রিক রীতিনীতিতে যে ত্রুটি এবং সংসদীয় রাজনীতিতে যতটুকু গ্যাপ দেখা দিয়েছিল, তার দায় নির্বাচন বর্জনকারী বড়ো একটি দলকে নিতে হয়েছে এবং দলটিকে এর কুফলও ভোগ করতে হয়েছে।

সংবাদপত্র তথা সাংবাদিকবান্ধব রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসার পর থেকে এদেশের তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণে এবং সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীদের কল্যাণে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা নজিরবিহীন। এ পদক্ষেপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– ২০০৯ সালের জুলাই থেকে কার্যকর হওয়া তথ্য অধিকার আইন (আরটিআই), যার আলোকে গঠিত তথ্য কমিশন জনগণের কল্যাণে প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। এ আইনে তথ্য সরবরাহের জন্য সারা দেশে সব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা নিয়োজিত রয়েছেন। গণমাধ্যমের কল্যাণে বর্তমান সরকারের বড়ো উদ্যোগ হচ্ছে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট গঠনের মাধ্যমে কর্মরত অসচ্ছল এবং অসুস্থ ও বয়োবৃদ্ধ সাংবাদিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। এছাড়া দেশের সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমগুলো অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করছে। দেশের বিভিন্ন স্তরের গণমাধ্যমকর্মী তথা সাংবাদিকরা কল্যাণ ট্রাস্টের অনুদানে আর্থিকভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে তাঁরা তাঁদের চিন্তা ও কর্মকে দেশের কাজে লাগাতে পারছেন। সংবাদপত্রে তাঁদের লেখনী এবং অন্যান্য গণমাধ্যমে বিভিন্ন টকশো, মতবিনিময় ও আলোচনা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশে দুর্নীতি, জঙ্গিপনা, সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রপন্থা, ধর্মান্ধতাসহ বিভিন্ন মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে জনমত তৈরি হচ্ছে, যার মাধ্যমে নির্বাচনে গণমুখী রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তির পক্ষে জনগণের সমর্থন ও সহানুভূতি বাড়ছে বলে দেশপ্রেমিক সচেতন মহল ধারণা করছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে সমাজের বিভিন্ন স্তরের গণবিরোধী শক্তিগুলো ধীরে ধীরে আরও দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য। তবে এজন্য আরও দায়িত্বশীল হওয়ার লক্ষ্যে গণমাধ্যমকে আরও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে এবং এজন্য গণমাধ্যমে নিয়োজিত সব ব্যক্তিকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বর্তমানে ইন্টারনেট, ফেসবুক, ইউটিউবসহ সব সামাজিক মাধ্যমে এবং প্রথম সারির গণমাধ্যমেও অনেক সময় গুজব ছড়ানোর যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি, তা থেকে জনগণকে সুরক্ষা দিতে না পারলে গণমাধ্যমের সব অর্জন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

দীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম ও ত্যাগতিতিক্ষার বিনিময়ে এদেশের মানুষ স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অর্জন করেছে। সময়ের বিবর্তনে গণমাধ্যমের জগতে আজকের যে বিশাল আকার, সেটাও এই স্বাধীনতারই ফসল। এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার বিকাশ এবং যে কোনো নির্বাচন ও নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণায় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে দায়িত্বশীল গণমাধ্যমের নিয়ামক শক্তিকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। অবস্থা এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, গণমাধ্যম ছাড়া বর্তমান সময়ে একটি দিনও চলা কঠিন। এ পরিপ্রেক্ষিতে গণমাধ্যম, গণতন্ত্র ও নির্বাচন– এসবকিছুর কর্মকাণ্ডে জনগণ ও দেশের স্বার্থকে সবার ওপরে স্থান দেওয়া হচ্ছে কি না, সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে বলা হয়েছে, 'Freedom of the press belongs to the people'। আর স্বাধীনতার পর ১৯৭২

সালে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্বোধনী ভাষণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, নীতিমালা মেনে পত্রিকাগুলোকে দায়িত্বশীল হতে হবে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।' অতি সম্প্রতি, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বুধবার সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে অসুস্থ-অসচ্ছল এবং দুর্ঘটনাজনিত আহত ও নিহত সাংবাদিকদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের দেশের কল্যাণে গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, 'যেটা দেশের কল্যাণে লাগবে, আমি আশা করি আপনারা সেটা করবেন।' তিনি বলেন, 'আমরা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। এখানে একটা কথা আছে, স্বাধীনতা ভালো, তবে তা বালকের জন্য নয়। কাজেই এ ধরনের বালখিল্য ব্যবহার যেন কেউ না করতে পারে, সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া উচিত।' গণমাধ্যমকে সমাজের দর্পণ আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'মিডিয়ার মাধ্যমে সাংবাদিকরা এমন প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুস্থ জনগণের কথা, বিপন্ন মানুষের কথা তুলে আনেন, ফলে তাদের পাশে দাঁড়াতে সরকারের সুবিধা হয়।'

তাই এদেশে কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, অনলাইন, ফেসবুকসহ সোশ্যাল মিডিয়ার আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশ ও জনগণকে স্বস্তি দিতে হলে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্যও জনগণের সচেতনতা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একসময় এ দেশে মানুষ সমাজের প্রয়োজনে যেভাবে সচেতনভাবে এগিয়ে আসত, সেই চেতনায় বর্তমানে কিছুটা হলেও ভাটা পড়েছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর রাজধানীতে তথ্য কমিশন আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্যে প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ বলেন, 'দেশে তথ্যের বিশাল চাহিদার তুলনায় তথ্যপ্রাপ্তির আবেদন অনেক কম। নিরক্ষরতা, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অসচেতনতা, প্রশাসনিক পদ্ধতি সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা এর মূল কারণ। ... দেশের সব আইন প্রয়োগ করে সরকার বা রাষ্ট্রযন্ত্র। কিন্তু তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে জনগণ।' তাই গণতন্ত্র এবং নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে স্থায়ী শান্তি, স্বস্তি ও সত্য প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হিসেবে জনগণকে সচেতন করে তোলার মহান দায়িত্বটি আজকের দিনের গণমাধ্যমের ওপরই পড়েছে। বর্তমানে গণমাধ্যমজগতের আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, এগুলোর মালিকানা এবং কর্তৃত্ব এখন পেশাজীবী-সাংবাদিক-সম্পাদকের হাতে খুবই কম, মালিকানা চলে গেছে ব্যবসায়ীদের হাতে। অপরদিকে, দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বা গণমাধ্যম বিষয়ে উচ্চ ডিগ্রি নিয়ে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী পাস করে বের হলেও অপেক্ষাকৃত বেশি মেধাবীরা সাংবাদিকতায় না এসে অন্য পেশায় ঢুকছে। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হিসেবে সাংবাদিকতার অঙ্গনে মেধাবীদের আগমন কমে যাচ্ছে বলে অনেক চিন্তাবিদ আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, যা গণমুখী সাংবাদিকতা তথা গণমাধ্যমজগতের জন্য নতুন একটি সমস্যা তৈরি করছে। তাই দেশে সাংবাদিকতায় দায়িত্বশীলতা ও গণসম্পৃক্ততা বাড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সবার নতুন করে চিন্তাভাবনার অবকাশ রয়েছে। এ জগতে দায়িত্বশীল, সমাজসচেতন ও গণমুখী ও সমাজকল্যাণে নিবেদিত কর্মীর সংখ্যা যত বেশি বৃদ্ধি পাবে, ততই দেশের জন্য কল্যাণকর হবে। গণতন্ত্রের স্বার্থে বিশেষ করে একাদশ জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশের মানুষের মাঝে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি করতে গণমাধ্যম গণতন্ত্র ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সবাইকে এই ভূমিকা পালনের জন্য আরও বেশি ধৈর্যশীল ও দায়িত্ববান হওয়ার ডাক দিয়ে যায়। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্যই ছিল একটি শোষণমুক্ত, বৈষম্যহীন, শান্তিপূর্ণ, সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা, যেখানে সব মানুষ প্রাণ খুলে গাইবে– 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি।'

লেখক: রিচার্স অফিসার, পিআইবি

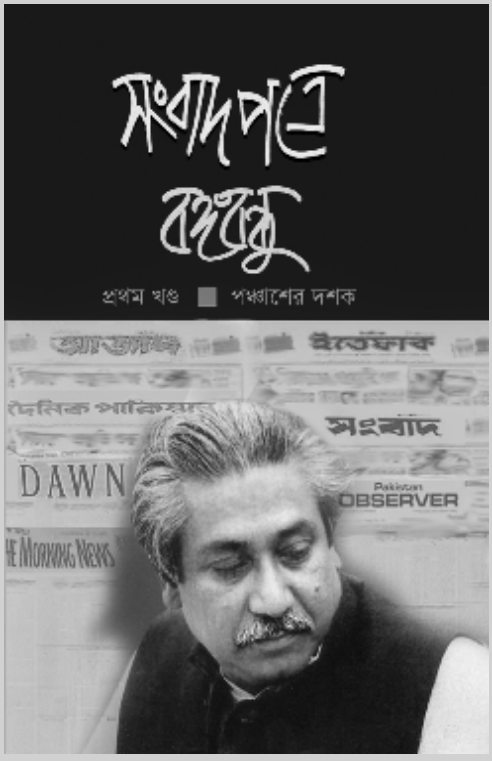

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

প্রসঙ্গ নির্বাচনঃ গণমাধ্যমের করণীয়

ড. জ্যোৎস্নালিপি

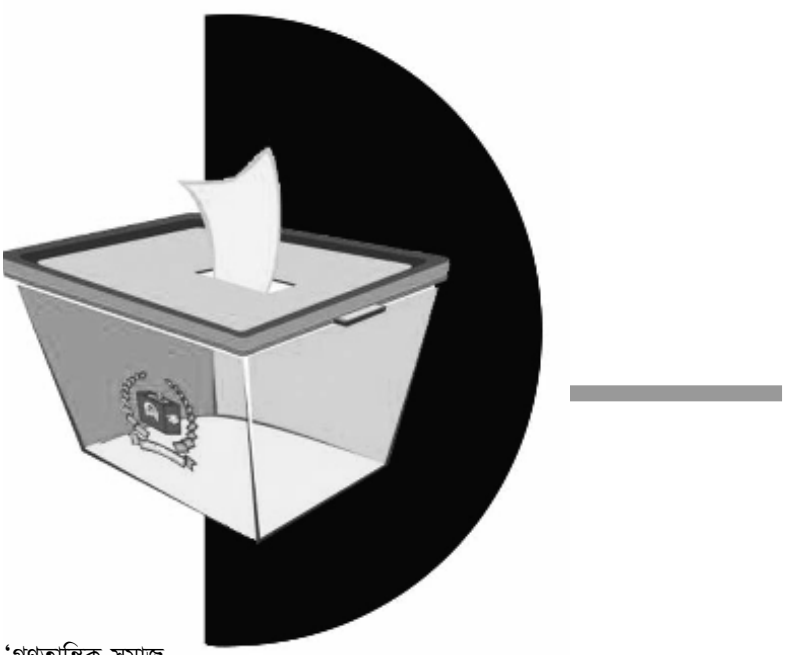

নোয়াম চমস্কি'র সেই উক্তি দিয়েই শুরু করা যাক– 'গণতান্ত্রিক সমাজ মানে এমন এক সমাজ যেখানে নিজেদের যাবতীয় বিষয় আশয়ের ব্যবস্থাপনায় অর্থপূর্ণভাবে অংশ নেওয়ার উপায় সাধারণ মানুষের আছে। পাশাপাশি সেখানে সংবাদ কিংবা তথ্যের মাধ্যম খোলামেলা ও স্বাধীন।' গণমাধ্যম নির্বাচনে দুর্নীতি, যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে জনগণকে সজাগ এবং সকল অনিয়ম উদ্ঘাটনে ভূমিকা রাখতে পারে।

গণমাধ্যমই গণতন্ত্রে ভোটারদের তথ্যের জন্য প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। গণমাধ্যম নির্বাচনের নানা বিষয় তুলে ধরে জনগণ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সরকারকে সচেতন করতে পারে। গণতন্ত্রকে সুসংহত করার ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করতে পারে গণমাধ্যম।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই নির্বাচনকেন্দ্রিক সংবাদ এবং এ সংক্রান্ত ভাবনা শুরু করে। গণমাধ্যমে 'নির্বাচনী বছর' কথাটাও আগে থেকে চালু হয়ে যায়। গণমাধ্যম ভোটার মতামত জরিপ, প্রার্থী বাছাই, নির্বাচনি এলাকা সম্পর্কে খবরাখবর, নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় নিয়ে সরকারের ভাবনা-চিন্তা, রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী সংস্কারের দাবি (যদি থাকে), নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতি, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রস্তুতি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গ, নির্বাচনী জোট গঠন প্রক্রিয়া, বিভিন্ন আমলে দলগুলোর তুলনামূলক শক্তি, বিভিন্ন ইস্যুতে দলগুলোর অবস্থান, প্রার্থীদের মনোয়নের লবিং তৎপরতা, সম্ভাব্য প্রার্থীদের পরিচিতি, দুর্বলতা ও সামর্থ্য, অতীত নির্বাচন নিয়ে গবেষণা, অন্যান্য নির্বাচন নিয়ে জরিপ, জনগণ কোন ইস্যুগুলোকে জাতীয় জীবনের জন্য জরুরি বলে ভাবছে– রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্যে সেগুলোর প্রতিফলন আছে কিনা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের গঠন ইত্যাদি বিষয়ে নির্বাচনপূর্ব প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পারে। এছাড়া গণমাধ্যম নির্বাচন ঘোষণার দিন থেকে ফল ঘোষণার সময় পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন ঘোষিত তফসিল, আচরণবিধির সংযোজনী (যদি থাকে); রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহার; নির্বাচনি পর্যবেক্ষক দলগুলোর তৎপরতা ও রিপোর্ট, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রার্থী মনোনয়ন, মনোনয়নবঞ্চিত প্রার্থীদের তৎপরতা, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের পরিচিতি ও কর্মকাণ্ড, নির্বাচনি জনসভা, প্রার্থী পরিচিতি, কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্য, স্থানীয় মনোভাব, নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি– নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দলগুলোর, প্রার্থীদের, স্থানীয় প্রশাসনের, জনমত জরিপ– ভোটের ফল

> *একটি কার্যকর সংসদ ও দক্ষ সরকার পেতে হলে ভোটারদের প্রার্থী সম্পর্কে বিস্তার ধারণা থাকা প্রয়োজন। দেশের বেশির ভাগ মানুষ নিরক্ষর। ... করে জনগণকে সচেতন করতে পারে। নির্বাচনের আগে জনমত জরিপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জনমত জরিপ একদিকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী সম্পর্কে জনগণের মতামত তুলে ধরে*

কেমন হতে পারে তার আভাস, ভোটকেন্দ্রের পরিস্থিতি, নারী ভোটারদের অবস্থা ও অবস্থান নির্বাচনে নারী আসনবিষয়ক, ভোট গ্রহণ পরিস্থিতি, ভোটের দিন কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা– ভোট প্রদানে জালিয়াতি, ভোটকেন্দ্র দখল, সমর্থকদের সংঘর্ষ, ভোট গণনায় কারচুপি, বাতিল ভোটকেন্দ্র পরিস্থিতি, ভোট গ্রহণের শিডিউল; ফল ঘোষণা এবং ফলাফলের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া গ্রহণ ও বর্জন। এছাড়া নির্বাচনোত্তর সময়ে গণমাধ্যমে ফলকে স্বাগত জানিয়ে উল্লাস, নির্বাচান ফল (যদি থাকে) বর্জনের ঘটনা– প্রতিবাদ মিছিল, বাতিল ভোটকেন্দ্রে নতুন ভোট, ভোট নতুন করে গণনা, নির্বচনি ট্রাইব্যুনালে মামলা, নির্বাচন পর্যবেক্ষক দলের প্রতিবেদন, রাজনৈতিক দলগুলোর আসন সংখ্যার মূল্যায়ন, সরকার গঠনের বিভিন্নমুখী তৎপরতা– সম্ভাব্য সরকারের অংশীদার করা, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলগুলোর সরকার গঠন, মন্ত্রিসভার দায়িত্ব বণ্টন, সংসদে প্রথম অধিবেশন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, একাধিক আসনে বিজয়ীদের ছেড়ে দেওয়া আসনগুলোয় উপনির্বাচন; এছাড়া নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন হামলা, নির্যাতন, মামলা, হত্যার ঘটনা বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে পারে। এছাড়াও গণমাধ্যম বিভিন্ন নির্বাচনি এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার করে প্রকৃত অবস্থা জানতে পারে। একই সঙ্গে কোথায় কী বাড়তি ব্যবস্থা প্রয়োজন, সেবিষয়ক প্রশাসনকে সচেতন করে তুলতে পারে। বিশেষ করে সহিংসতা-প্রবণ এলাকাগুলোর জন্য এরকম সংবাদ প্রকাশ ও প্রচার খুবই জরুরি বিষয়। উদাহরণস্বরূপ প্রথম আলোর ১২ মে ২০০১ সংখ্যার সম্পাদকীয়তে ৮ম সংসদ নির্বাচনে স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোর কথা তুলে ধরা হয়। নির্বাচন কমিশনার, পুলিশ প্রশাসন, নির্বাচনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নির্বাচনি এলাকার জনগণ ইত্যাদি সব শ্রেণির নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সাক্ষাৎকার নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করলে নিরাপত্তা সম্পর্কে সঠিক চিত্র পাওয়া যেতে পারে। আবার নির্বাচনের আগে নির্বাচনি প্রচার দেখে সংহিসতার পরিমাণ অনুমান করে জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে পারে। যেমন– চ্যানেল আই'-এ 'নির্বাচনী ভাবনা ২০০১'-এ জনগণকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল দল বেঁধে ভোট দিতে যাওয়ার জন্য; দল বেঁধে থাকলে সহিংসতা কমার সম্ভাবনা থাকে।

গণমাধ্যম নির্বাচনে দুর্নীতি সম্পর্কে জনগণকে আবহিত করতে পারে। যেমন– ২০০১ সালের ৮ মে প্রথম আলো পত্রিকায় 'নির্বাচনি গম' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়েছে– 'নির্বাচনকে সমানে রেখে উপজেলা সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে গম বিতরণের নীতিমালার পরিবর্তন করে মন্ত্রীদের সুপারিশের মাধ্যমে গম বিতরণের নীতি নেওয়া হয়েছে।' মোটকথা, নির্বাচনে সহিংসতা ও দুর্নীতিবিষয়ক প্রতিবেদন গণমাধ্যমে আগে থেকে প্রকাশ ও প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে তুলতে পারে। এ ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে অনিয়ম কমার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

একটি কার্যকর সংসদ ও দক্ষ সরকার পেতে হলে ভোটারদের প্রার্থী সম্পর্কে বিস্তার ধারণা থাকা প্রয়োজন। দেশের বেশির ভাগ মানুষ নিরক্ষর। ফলে গণমাধ্যম প্রতিটি নির্বাচনি এলাকা থেকে যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হন, তাদের যোগ্যতা, দক্ষতা, সততা সম্পর্কে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশ করে জনগণকে সচেতন করতে পারে। নির্বাচনের আগে জনমত জরিপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জনমত জরিপ একদিকে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী সম্পর্কে জনগণের মতামত তুলে ধরে। অন্যদিকে নির্বাচনে সম্ভাব্য বিজয়ী প্রার্থী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে এই জরিপগুলো জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করতে পারে। নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর নির্বাচনি ফল নিয়ে মানুষ অনেক বেশি উৎকণ্ঠায় থাকে, এক্ষেত্রে গণমাধ্যম খুব দ্রুততার সঙ্গে নির্বাচনি ফল জানিয়ে দিতে পারে। প্রত্যেক নির্বাচনেই আগেই প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনা, নীতি, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি এবং প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়ে ইশতেহার প্রকাশ করে। গণমাধ্যম যদি এই ইশতেহারগুলো বিশ্লেষণ করে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি ইশতেহার প্রায়ই প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে, তবে সরকারকে জবাবদিহিতার জায়গায় দাঁড় করাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে গণতন্ত্র উত্তরণের পথও সুগম হয়।

বাংলাদেশের গণমাধ্যম নির্বাচনি বছরে নির্বাচন সংক্রান্ত সংবাদকেই বেশি প্রাধান্য দেয়, যা গণমাধ্যমের বিভিন্ন সংবাদ বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়– ২০০১ সালের ২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার পথম পাতা ও শেষ পাতার আধেয় বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোট সংবাদের শতকরা ৯৪ ভাগ ছিল নির্বাচন সংক্রান্ত। দৈনিক প্রথম আলোর ২০০১ সালের ২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রথম পাতায় নির্বাচনের খবর ৫০টি, খেলার খবর ৭টি, পরিবেশের খবর ১টি, উন্নয়ন ও অন্যান্য বিষয়ক সংবাদ ১টি। অর্থাৎ মোট সংবাদ ছিল ৫৯টি, এর মধ্যে নির্বাচনবিষয়ক সংবাদ ৫০টি। অর্থাৎ মোট সংবাদের ৮৪.৭৪ ভাগ নির্বাচনবিষয়ক সংবাদ।

২০০১ সালের ২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর শেষ পাতায় মোট সংবাদ ছিল ৩৬টি, যার মধ্যে নির্বাচনবিষয়ক সংবাদ ৩০টি। অর্থাৎ মোট সংবাদের ৮৩.৩৩% নির্বাচনবিষয়ক। অর্থাৎ প্রথম ও শেষ পাতা মিলিয়ে মোট সংবাদ ৯৫টি, এর মধ্যে নির্বাচনবিষয়ক সংবাদ ৮০টি। অর্থাৎ মোট সংবাদের ৮৪.২১% ছিল নির্বাচনবিষয়ক। ২০০১ সালে নির্বাচনে ইটিভি প্রতিদিন বিকেল ৫টা ৩০ থেকে ৬টা পর্যন্ত মুক্তমঞ্চ নামে নির্বাচনি অনুষ্ঠান, নির্বাচনি সংলাপ নামে একটি অনুষ্ঠান এবং প্রসঙ্গ নির্বাচন নামে সংবাদবিষয়ক ২৫ মিনিটের অনুষ্ঠান প্রতি শনি ও মঙ্গলবার প্রচার করেছে। চ্যানেল আই প্রতিদিন আইন প্রবাহ নামে সংবাদবিষয়ক অনুষ্ঠান, নারীর ভোটের অধিকার নামে একটি অনুষ্ঠান এবং ভোটের লড়াই ও ফেস টু ফেস নামে আরও দুটি অনুষ্ঠান প্রচার করেছে।

এটিএন বাংলা দুটি রাজনৈতিক দলকে চাঙ্ক ভাড়া দেয় ২৫ মিনিটের জন্য। বাংলাদেশ টেলিভিশন 'চেতনা বাংলাদেশ' নামে ৫০ মিনিটের নির্বাচনবিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচার করেছে। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে– নির্বাচন ইস্যুতে গণমাধ্যম বেশ তৎপর থাকে। গণমাধ্যমের এই তৎপরতাই ভোটারদেরকে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে ও সচেতন হতে সাহায্য করে।

জনগণ হয়তো গণমাধ্যমের কাছে সরাসরি সব সমস্যার সমাধান আশা করে না কিন্তু সমাধানের ব্যাপারে দ্রুত ও কার্যকর মতামত গঠনের জন্য সহায়তা পেতে চায়। সুতরাং গণমাধ্যমকে করতে হবে জনগণের জন্য সহজলভ্য। নাগরিকদের ভোটাধিকার রক্ষায় গণমাধ্যম প্রহরীর ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যম গণমানুষের হয়ে কাজ করে

কথা হচ্ছে– নির্বাচনি স্বচ্ছতা ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনের প্রশ্নে গণমাধ্যমে সঠিক তথ্য প্রচার বা প্রকাশ করতে পারার স্বাধীনতা কতখানি? গণমাধ্যম কি আসলে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে? সংবাদ প্রকাশের জন্য গণমাধ্যমকর্মীদের আদৌ কি কোনো নিরাপত্তা আছে? বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নির্বাচনে ভোট জালিয়াতি ও নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের হস্তক্ষেপের সমালোচনা এবং সন্ত্রাসবিরোধী প্রতিবেদনের জন্য গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের ওপর নেমে আসে ভয়াবহ নির্যাতন। ২০০১ সালে প্রকাশিত সিপিজে'র বার্ষিক প্রতিবেদনে ২০০০ সালে ২৫ জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে, এর মধ্যে ২ জন বাংলাদেশি সাংবাদিক। প্রতিবেদনে সাংবাদিক হত্যার পেছনে প্রশাসনের বিপক্ষে রাজনৈতিক প্রতিবেদন রচনা, সন্ত্রাসবিরোধী প্রতিবেদন লেখা, ভোট জালিয়াতি ও নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদের হস্তক্ষেপের সমালোচনার কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং সঠিক তথ্য প্রচার ও প্রকাশের জন্য গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রয়োজন সবার আগে।

জনগণ হয়তো গণমাধ্যমের কাছে সরাসরি সব সমস্যার সমাধান আশা করে না কিন্তু সমাধানের ব্যাপারে দ্রুত ও কার্যকর মতামত গঠনের জন্য সহায়তা পেতে চায়। সুতরাং গণমাধ্যমকে করতে হবে জনগণের জন্য সহজলভ্য। নাগরিকদের ভোটাধিকার রক্ষায় গণমাধ্যম প্রহরীর ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যম গণমানুষের হয়ে কাজ করে।

গণমানুষের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। আর এই নির্বাচন অনুষ্ঠান অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হওয়ার জন্য গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সুতরাং বাংলাদেশে নির্বাচন প্রশ্নে গণমাধ্যমকে আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

লেখক: *সাহিত্যিক ও সহকারী সম্পাদক, পিআইবি*

নির্বাচন: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ফেক নিউজ

মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী

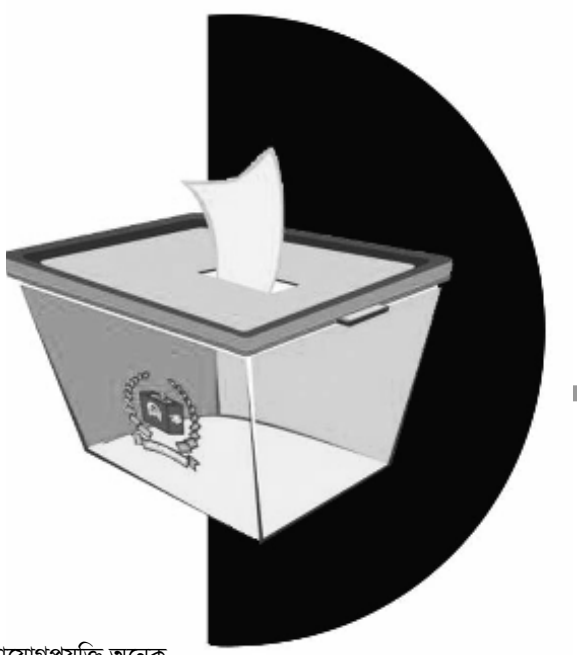

নির্বাচন কাভারেজের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের জন্য যোগাযোগপ্রযুক্তি অনেক নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এখন প্রত্যেকটি নির্বাচন কাভারেজের ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা নিত্যনতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন। এমন কোনো সংবাদকক্ষ পাওয়া যাবে না, যেখানে যোগাযোগ প্রযুক্তি ছাড়া নির্বাচন কাভারেজের কোনো পরিকল্পনা হয়। নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তির মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও আলোচিত মাধ্যম হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। নির্বাচনি কাভারেজের ক্ষেত্রে প্রচলিত গণমাধ্যমের জন্য সামাজিক গণমাধ্যমগুলো একদিকে যেমন অনেক সুযোগ সৃষ্টি করছে, তেমনি নতুন নতুন চ্যালেঞ্জও তৈরি করছে। ব্রেকিং নিউজের উৎস, তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যম, গুজব-রটনাকারী ও গণবিতর্কের স্থল ইত্যাদি নানাবিধ কারণে সামাজিক গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা এখন বহুমুখী ও বহুরূপী। এসব কারণে প্রচলিত মূলধারার গণমাধ্যমগুলো নির্বাচনের সময় সামাজিক গণমাধ্যমকে অবহেলা করতে পারে না। বরং ভালো নির্বাচনি প্রচার কাভারেজের জন্য সামাজিক গণমাধ্যমগুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে পরিকল্পনা সাজাতে হয়। এ কারণে উন্নত বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত ও নামকরা সংবাদমাধ্যমগুলো একজন সামাজিক গণমাধ্যম সম্পাদক এবং সামাজিক গণমাধ্যম রিপোর্টারদের নিয়োগ দেয়। তারা সামাজিক গণমাধ্যম বিষয়ে একটি টিম গঠন করে থাকে। এ টিমের সদস্যরা সব ওয়েবসাইট পর্যবেক্ষণ করে সেখান থেকে দরকারি তথ্য, ছবি, ভিডিও, অডিও সংগ্রহ করে এবং তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে তা যথাযথ সূত্রের উল্লেখ করে প্রচার করে।

তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিয়ে সবসময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কারণ সামাজিক গণমাধ্যম একদিকে যেমন সংবাদের হাতিয়ার, তেমনি এটি গুজব, মিথ্যা ও হিংসার উৎস। তথ্যের উৎস হিসেবে বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে যেমন অস্বীকার করা যাবে না, তেমনি এটি সাংবাদিকতায় ভুল, মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্যের পরিমাণ বাড়িয়েছে। টুইটার গবেষক Hermida (2012,1) মনে করেন, 'The development of social networks for real-time news and information, and the integration of social media content in the news media, creates tensions for a profession based on a discipline of verification.'

নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তির মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ও আলোচিত মাধ্যম হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। ... সৃষ্টি করছে, তেমনি অন্যদিকে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জও তৈরি করছে। ব্রেকিং নিউজের উৎস, তথ্য যাচাইয়ের মাধ্যম, গুজব-রটনাকারী ও গণবিতর্কের স্থল ইত্যাদি নানাবিধ কারণে সামাজিক গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা এখন বহুমুখী ও বহুরূপী

২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় থেকে সামাজিক গণমাধ্যম ব্যবহার করে মিথ্যা, ভুয়া বা ফেক নিউজ ছড়ানোর বিষয়টি বিশ্বব্যাপী ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। ওই বছর অক্সফোর্ড ডিকশনারির বিবেচনায় সবচেয়ে আলোচিত শব্দ ছিল 'ফেক নিউজ'। ২০১৭ সালে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কল্যাণে শব্দটি আলোচিত শব্দাবলির তালিকায় ছিল। ট্রাম্প সিএনএনের প্রতিবেদক জিম অ্যাকোস্টোকে বলেছিলেন, 'আপনি ফেক নিউজ'। এরপর টুইটারে তিনি প্রায়ই এ শব্দবন্ধ ব্যবহার করেন এবং কিছুদিন পর 'ফেক নিউজ অ্যাওয়ার্ড' ঘোষণা করেন। এরপর জার্মানি, মেক্সিকো ও অস্ট্রেলিয়ার নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল ফেক নিউজ।

ফেক নিউজ শব্দবন্ধটি নতুন কিছু নয়। ১৮০৭ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসন অভিযোগ করেছিলেন, 'সংবাদপত্র যিনি পড়েন তার চেয়ে সংবাদপত্র যিনি পড়েন না, তিনি কোনো ঘটনা সম্পর্কে অনেক ভালো তথ্য জানেন।' (Uberti 2016)। ফেক নিউজ বা ভুয়া খবর বলতে বোঝানো হয় পুরো মিথ্যা তথ্যের ওপর নির্ভর করে তৈরি করা সংবাদ। এটির প্রচলন আগেও ছিল। যেটি নতুন এবং পরিবর্তন হয়েছে সেটি হলো, কীভাবে মানুষ ভুয়া সংবাদ গ্রহণ করছে এবং সংজ্ঞায়িত করছে। আগে প্রচলিত গণমাধ্যমের সাহায্যে ভুয়া সংবাদ ছড়ানো হতো, এখন অনলাইন ও সামাজিক গণমাধ্যমের সাহায্যে বেশি ছড়ানো হচ্ছে। ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ায় এর প্রভাব ও ভয়াবহতাও আগের তুলনায় অনেক বেশি। কারণ ইন্টারনেটের প্রসার ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রচলনই ভুয়া সংবাদকে সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। আর এতে সংবাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

চরিত্র হনন, ব্র্যান্ডিং, জনসংযোগ, নিউজ ম্যানেজমেন্ট, প্রচারণা বা মিথ্যা প্রচার, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা– এসবই নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক কৌশল বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। নির্বাচনের সময় ফেক নিউজ বা ভুয়া সংবাদের লক্ষ্য থাকে রাজনৈতিক ফায়দা লুটা আর উপলক্ষ্য হয় চরিত্র হনন। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একজন ব্যক্তির সুনাম ক্ষুণ্ন করা হলো চরিত্র হনন। এর মাধ্যমে ব্যক্তির জন্ম, পারিবারিক পরিচিতি, সাফল্য– সবকিছু প্রশ্নবিদ্ধ করতে দেখা যায়।

২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে ফেক বা ভুয়া নিউজের ছড়াছড়ি এবং এসব নিউজ প্রচারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে বেশকিছু গবেষণা হয়েছে। এসব গবেষণার ভিত্তিতে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ফেক বা ভুয়া নিউজের প্রভাব না থাকলে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন না। নিউইয়র্ক ম্যাগাজিনের রাজনৈতিক বিশ্লেষক ম্যাক্স রিডের একটি লেখার শিরোনাম হলো, 'Donald Trump Won Because of Facebook.' (Read 2016)। গার্ডিয়ানের রাজনৈতিক বিশ্লেষক পারকিনসনের লেখার শিরোনাম ছিল, 'Click and elect: how fake news helped Donald Trump win a real election.' (Parkinson 2016)।

যুক্তরাষ্ট্রের ওহাইয়ো স্টেট ইউনিভার্সিটির এক গবেষণায় দেখা গেছে, নির্বাচনি প্রচার চলাকালে ছড়ানো কিছু মিথ্যা খবর নির্বাচনের দিন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের বহু সমর্থককে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। গবেষণাটির তথ্য অনুসারে, ২০১২ সালে প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সমর্থক থাকা প্রায় ৪ শতাংশ ভোটার মিথ্যা সংবাদ বিশ্বাস করে ২০১৬ সালের নির্বাচনে হিলারির ওপর থেকে সমর্থন তুলে নিয়েছিলেন। রিচার্ড গান্থার, পল এ বেক এবং এরিক সি নিসবেট নামের তিন গবেষণাকারী তাদের গবেষণার জন্য ২০১৬ সালের নির্বাচনি প্রচার চলাকালে সাড়া ফেলে দেয়া তিনটি ভুয়া খবর বেছে নেন। 'ইউগভ' নামের ওই গবেষণায় ৫৮৫ জন ওবামা সমর্থকের ওপর জরিপটি চালানো হয়, যাদের ২৩ শতাংশ হিলারিকে ভোট দেননি। ওবামা সমর্থকরা যে তিনটি সংবাদকে 'সম্ভবত সত্য' হিসেবে বিশ্বাস করেছিলেন সেগুলো এরকম:

* হিলারি জটিল রোগের কারণে গুরুতর অসুস্থ (১২ শতাংশ বিশ্বাস করেছিলেন)।
* পোপ ফ্রান্সিস ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন (৮ শতাংশ বিশ্বাস করেছিলেন)।
* হিলারি বিভিন্ন ইসলামি চরমপন্থি ও জঙ্গি সংগঠন, এমনকি আইএসের কাছেও অস্ত্র বিক্রির অনুমতি দিয়েছেন (২০ শতাংশ বিশ্বাস করেছিলেন)।

সার্বিকভাবে ওবামার সমর্থকদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এ তিনটির অন্তত একটি সংবাদ বিশ্বাস করতেন। সেই বিশ্বাসীদের ৪৫ শতাংশ হিলারির পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। অন্যদিকে ভুয়া খবরে বিশ্বাস না করা ভোটারদের ৮৯ শতাংশই ভোট দিয়েছিলেন হিলারিকে।

এই নির্বাচনে ফেক নিউজের ব্যাপকতা এত বেশি ছিল যে, ওয়াশিংটন পোস্ট তাদের একটি সংবাদের শুরু করে এভাবে, 'It's official: Truth is dead. Facts are passe.' (Wang 2016)। ২০১৬ সালের নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের ছোট্ট শহর ভেলেস থেকেই শুধু শ'খানেক সংবাদভিত্তিক ওয়েবসাইট প্রকাশিত হতো, যেগুলোর কাজ ছিল ট্রাম্পপন্থি ফেক নিউজ প্রচার করা। এই নির্বাচনে ১৪০টি ভুয়া নিউজের ওয়েবসাইট খুঁজে পেয়েছিল গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। (CNBC 2016)। ফেক নিউজের ওয়েবসাইটগুলোর দৌরাত্ম্য এত বেশি ছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনি ফল নিয়ে গুগলের সার্চে প্রথমেই দেখা গিয়েছিল এদের সংবাদ। (Earl 2016)। যেমন, এমন একটি সংবাদ ছিল ট্রাম্প পপুলার ভোট ও ইলেকটোরাল কলেজ ভোটে জিতেছেন। অথচ হিলারি পপুলার ভোটে এগিয়ে ছিলেন।

ভুয়া নিউজ কীভাবে ছড়ায়, সে বিষয়ে জার্মানির একটি উদাহরণ টেনেছে জার্মান সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলের বাংলা রেডিও (DW, 'ভুয়া খবর যেভাবে তৈরি হয় ও ছড়ায়', 2017)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ব্রাইটবার্ট.কম' জার্মানির ডর্টমুন্ড শহরে হাজার হাজার মানুষের নববর্ষ উদযাপনের খবরের শিরোনাম করে, 'নিউ ইয়ার্স ইভে ১,০০০ মানুষের দঙ্গল পুলিশকে আক্রমণ করেছে ও জার্মানির প্রাচীনতম গির্জায় আগুন ধরিয়েছে।' ব্রাইটবার্ট ডর্টমুন্ডের ঘটনার 'অল্ট-রাইট' সংস্করণ প্রকাশের পর প্রথম জার্মান ভাষাভাষী পত্রিকা হিসেবে অস্ট্রিয়ার 'ভোখেনব্লিক' পত্রিকা ব্রাইটবার্টের প্রতিবেদন প্রকাশ করে। 'ভোখেনব্লিক'-এর শিরোনাম ছিল, 'ডর্টমুন্ডে নিউ ইয়ার্স ইভ: আল্লাহু আকবর ও গির্জায় আগুন'। সামাজিক গণমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া এ সংবাদটি পুরোটাই ছিল বানোয়াট।

'ব্রাইটবার্ট.কম'-এ প্রকাশিত ফেক বা ভুয়া নিউজ

ফেক বা ভুয়া নিউজগুলো বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে আসে। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এ ধরনের মিথ্যা ও বানোয়াট খবর প্রচারের উদ্দেশ্যে কিছু ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়। যেমন, ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হিলারি ক্লিনটনের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট খবর প্রচারের জন্য তৈরি হয় denverguardian.com নামক ওয়েবসাইটটি। ২০১৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে এই ওয়েবসাইটে 'FBI Agent Suspected In Hillary Email Leaks Found Dead In Apparent Murder-Suicide' শিরোনামে একটি বানোয়াট ও মিথ্যা খবর প্রচার করে। ৫ লাখ লোক এই খবরটি শেয়ার করে এবং দেড় কোটিরও বেশি মানুষ এই খবরটি পড়েছে। এ ওয়েবসাইটের মালিক জেস্টিন কোলার রাতারাতি বনে যান 'ফেক নিউজের রাজা'। এ ধরনের ভুয়া নিউজের ওয়েবসাইটগুলো প্রতিষ্ঠিত বা নামিদামি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটের সঙ্গে মিল রেখে নিজেদের নাম রাখে। যেমন, একটি ফেক নিউজ সাইট হলো washingtonpost.com.co (আসল নিউজ সাইট হলো washingtonpost. com)। নিজেদের যোগাযোগের ঠিকানাও দেয় নামিদামি প্রতিষ্ঠানের অনুকরণে। যেমন, denverguardian.com সাইটটির ঠিকানা দেওয়া ছিল বিশ্ববিখ্যাত গার্ডিয়ান পত্রিকার পার্কিং লট। আবার কিছু ওয়েবসাইট থাকে স্যাটায়ার বা রম্য ধরনের। এগুলোয় প্রকাশিত কোনো কৌতুক বা রম্য আর্টিকেলকে অন্য একটি সাইটে খবর হিসেবে প্রচার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিগত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে wtoe5news.com নামক একটি ওয়েবসাইট এ ধরনের খবর প্রচার করত। গবেষণায় দেখা গেছে, নির্বাচনের সময় দুটি উদ্দেশ্যে মূলত এ ধরনের ফেক নিউজের ওয়েবসাইট চালু করা হয়। প্রথমত, এ ধরনের ফেক নিউজের মাধ্যমে প্রচুর আয় হয়। অনলাইনে ক্লিকের ভিত্তিতে বিজ্ঞাপনের অর্থ আসে। সে কারণে নির্বাচনের সময় এ ধরনের ফেক নিউজ যত বেশি শেয়ার ও পড়া হয়, তত বেশি অর্থ আয় হয়। দ্বিতীয় কারণটি আদর্শগত। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য কোনো দল বা প্রার্থী এ ধরনের ফেক নিউজ ওয়েবসাইট করে থাকে।

সামাজিক গণমাধ্যমকে তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহারের জন্য সাংবাদিকদের বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে। সাংবাদিকদের মনে রাখতে হবে, সামাজিক গণমাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান হয়, তর্ক-বিতর্ক হয়। কিন্তু তথ্য ও সংবাদ এক জিনিস নয়। কোথাও বৃষ্টি হলো বা আগুন লাগল, কেউ একজন তার ছবি তুলে ফেসবুকে শেয়ার করল এবং লিখল যে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে বা আগুনে অনেক ক্ষতি হয়েছে। এটি কিন্তু সাংবাদিকতা নয়। সাংবাদিকতা একটি পেশা। এই পেশার নির্দিষ্ট আচরণ ও নীতিনৈতিকতা আছে। নির্ভুলতা/যথার্থতা, ভারসাম্য ও স্পষ্টতা– এ তিনটি নির্বাচনি রিপোর্টিংয়ের মৌলিক নীতি। এর বাইরে যাওয়ার সুযোগ সাংবাদিকদের নেই।

নির্বাচনি প্রচারের সময় সামাজিক গণমাধ্যম থেকে তথ্য নিয়ে তা প্রচারের ক্ষেত্রে ভুয়া অ্যাকাউন্ট ও ফেক নিউজ চিহ্নিত করার জন্য সাংবাদিকরা নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে পারেন:

* অ্যাকাউন্ট/ওয়েবসাইটের বৃত্তান্ত দেখুন
  টুইটার বা ফেসবুকের অ্যাকাউন্টে বৃত্তান্ত দেখুন। যদি সেখানে কোনো নাম না থাকে তাহলে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকুন। সন্দেহজনক ইউআরএল বা ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেখলে মূল ওয়েবসাইটে গিয়ে পরীক্ষা করা উচিত।
* পোস্টের স্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হোন
  বৃত্তান্তে ও পোস্টে ব্যক্তির স্থান সম্পর্কে তথ্য যাচাই করুন। মনে করুন, কেউ তার বসবাসের স্থান দিয়েছেন চট্টগ্রামে, অথচ তার প্রচারিত ভিডিওটি খুলনায়। সেক্ষেত্রে এ ভিডিওটিকে অবশ্যই সন্দেহের চোখে দেখতে হবে।
* খবরের সূত্র খেয়াল করুন
  যে সূত্রের বরাত দিয়ে খবরটি প্রচার করছে তা যাচাই করে দেখুন। দায়িত্বশীল কোনো ব্যক্তির নাম-পরিচয় দিয়ে খবরটি নিশ্চিত করা হয়েছে কি না ভেবে দেখুন। ভুয়া তথ্য যাচাই করতে গুগলের কাস্টম সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করুন।
* অ্যাকাউন্টধারীর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় জানা
  সংক্ষিপ্ত নামে অ্যাকাউন্ট খোলা যে কোনো ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় জানার চেষ্টা করুন।
* শিরোনাম নিয়ে সন্দিহান হতে হবে
  ভুয়া খবরের শিরোনামগুলো হয়ে থাকে চটকদারি। এগুলোর শেষে দাঁড়ির বদলে একটি বিস্ময়সূচক চিহ্ন থাকে।
* ব্রেকিং নিউজ সম্পর্কে সাবধান
  'ব্রেকিং নিউজ' বলে প্রচার করছে– এমন কোনো খবরের ক্ষেত্রে প্রচারকারী ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা করুন। কারণ সাংবাদিকতায় এ ধরনের শব্দ ব্যবহারকারী ব্যক্তি আদৌ সাংবাদিকতা পেশায় জড়িত না হলে তার উদ্দেশ্য ভিন্ন হতে পারে।
* অজানা অ্যাকাউন্ট/বেনামি সূত্রের তথ্য সম্পর্কে সচেতন হোন
  আপনি জানেন না এমন কোনো অ্যাকাউন্ট থেকে কোনো তথ্য প্রচার করতে হলে অবশ্যই গবেষণা করতে হবে। অজানা কোনো সূত্রের বরাত দিয়ে তুলে ধরা নিউজকে বিশ্বাস করবেন না। এক্ষেত্রে অন্য কোনো গণমাধ্যমে এ ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে কি না যাচাই করে দেখুন।
* বানান ও কাঠামো খেয়াল করুন
  ভুয়া নিউজ ওয়েবসাইটগুলোয় প্রচুর বানান ভুল থাকে। এদের লাইন ও অনুচ্ছেদের কাঠামোতেও অসংলগ্নতা থাকে।
* দিনক্ষণ যাচাই করুন
  ভুয়া খবরগুলোয় দিনক্ষণে প্রচুর অসংলগ্নতা থাকে। দেখা যাবে শুরুতে একটি তারিখের উল্লেখ থাকলে পরে অন্য একটি দিনের কথা বলা আছে। উল্লিখিত দিনটি সরকারি ছুটির দিন কি না যাচাই করে দেখুন।
* খবরটি কি কৌতুক
  খবর বা ওয়েবসাইটটি কৌতুক বা স্যাটায়ার কি না তা যাচাই করে দেখুন। যে সূত্রে খবর দেয়া হচ্ছে, সেটি এই ধরনের কৌতুকপূর্ণ খবর ছড়ায় কি না তা পরীক্ষা করে দেখুন।
* ছবি লক্ষ করুন
  খবর বা পোস্টে ব্যবহৃত ছবিগুলো ভালোভাবে খেয়াল করুন। ছবিতে অনেক কারসাজি থাকতে পারে। ছবির সত্যতা যাচাই করতে গুগল ইমেজে ফটো চেকিং টুলগুলো ব্যবহার করুন।

বাংলাদেশেও সাম্প্রতিক সময়গুলোয় সামাজিক গণমাধ্যমে ফেক নিউজ ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি আমরা দেখেছি। বিটিআরসি'র এক হিসাব অনুযায়ী, ৮৬.৭২ শতাংশ মানুষ বাংলাদেশে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে, যারা প্রধান ভুয়া বা মিথ্যা সংবাদ সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে দাঙ্গা বা সংঘর্ষ বাধিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা অস্ট্রেলিয়া যান ২০১৭ সালের ১৩ অক্টোবর রাতে। পরের দিন দৈনিক প্রথম আলোর এ বিষয়ে সংবাদের শিরোনাম ছিল, 'আমি বিব্রত', বিদেশ যাওয়ার আগে প্রধান বিচারপতি' এটা প্রধান শিরোনাম ছিল না। প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলামের শীর্ষ খবরটি ছাপা হয়। কিন্তু প্রথম আলো'র নামে যে খবরটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়, তার শিরোনাম হলো, 'সরকারের চাপের মুখে প্রধান বিচারপতির দেশত্যাগ'। প্রথম আলোর মাস্টহেড ব্যবহার করে কম্পিউটারে মেকআপ করে প্রতারকরা ওই শিরোনাম প্রধান শিরোনাম করে তার স্ক্রিনশট নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়। এনিয়ে প্রথম আলো একটি প্রতিবেদনও ছাপে, যার শিরোনাম 'এটা ভুয়া খবর'। সেখানে ভুয়া এবং সঠিক পত্রিকার ছবিও দেয়া হয় (DW, বাংলাদেশ: ভুয়া খবরে আসল পত্রিকা, 2017)।

এটা ভুয়া খবর

প্রথম আলোর ২০১৭ সালের ১৪ অক্টোবর তারিখের ছাপা পত্রিকার প্রথম পাতার অনুরূপ একটি ভুয়া পাতার স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এই স্ক্রিনশটে দেখা যাচ্ছে, 'সরকারের চাপের মুখে প্রধান বিচারপতির দেশত্যাগ' ও 'প্রধান বিচারপতিকে দেশত্যাগে বাধ্য করার হুমকি' শিরোনামে দুটি খবর দেখানো আছে। এর পাশে 'ক্ষমতা দেখাল সরকার' শিরোনামে প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের নামে একটি লেখা আছে। বাস্তবে প্রথম আলোর প্রথম পাতায় এ ধরনের কোনো খবর বা ছবি প্রকাশিত হয়নি, এটা একেবারেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।—কর্তৃপক্ষ

আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি গণতান্ত্রিক সমাজে সাংবাদিকতা বা গণমাধ্যম পাঁচ ধরনের ভূমিকা পালন করে। (McNair 2007, 19-20)। সেগুলো হলো– ১. চারপাশের ঘটনা নিয়ে জনগণকে তথ্য জানানো; ২. এসব ঘটনা ও তথ্যের গুরুত্ব এবং অর্থ সম্পর্কে জনগণকে শিক্ষিত করা; ৩. জনমত গঠন ত্বরান্বিত করতে জনপরিসরে উন্মুক্ত রাজনৈতিক আলোচনার প্লাটফর্ম বা ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করা; ৪. সাংবাদিকতার প্রহরীর ভূমিকা পালনের অংশ হিসেবে সরকারি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচারের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করা; এবং ৫. রাজনৈতিক মতাদর্শের অ্যাডভোকেসির চ্যানেল হিসেবে কাজ করা। গণমাধ্যমের এই ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করার জন্য যাচাই-বাছাইকৃত সত্য, নির্ভুল এবং বস্তুনিষ্ঠ তথ্য সংবাদে উপস্থাপন করতে হয়, যেখানে থাকবে না সাংবাদিকের নিজস্ব কোনো মতামত। সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের বিপরীতে ভুল, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে পরিবেশিত সংবাদকে বলা হয় ফেক নিউজ বা ভুয়া সংবাদ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া বা মিথ্যা সংবাদ এখন বিশ্বব্যাপী একটি আতঙ্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশেও আগামী নির্বাচনে ফেক নিউজ এবং সামাজিক গণমাধ্যমের সাহায্যে এর বিস্তৃতি সবচেয়ে বড়ো আতঙ্কে রূপান্তরিত হতে পারে। এজন্য এখন থেকে গণমাধ্যমের সঙ্গে জড়িত সবার সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র

1. Alam, Md. Habibul. *Is fake news rising in our media?* July 16, 2018. http://www.thefinancialexpress.com.bd/views/is-fake-news-rising-in-our-media-1531728516 (accessed September 03, 2018).
2. Blake, aron. *A new study suggests fake news might have won Donald Trump the 2016 election.* April 03, 2018. https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2018/04/03/a-new-study-suggests-fake-news-might-have-won-donald-trump-the-2016-election/?utm_term=.cc21975da7af (accessed September 04, 2018).
3. CNBC. *Read all about it the biggest fake news stories of 2016.* December 30, 2016. https:// www.cnbc. com/2016/12/30/read-all-about-it-the-biggest-fake-news-stories-of-2016.html (accessed September 06, 2018).
4. DW. 'ভুয়া খবর' যেভাবে তৈরি হয় ও ছড়ায়, January 06, 2017. https://www.dw.com/bn (September 09, 2018).
5. DW. বাংলাদেশ: ভুয়া খবরে আসল পত্রিকা, October 18, 2017. https://www.dw.com/bn (accessed September 09, 2018).
6. Earl, Jennifer. *Google's top search result for "final election numbers" leads to fake news site.* November 14, 2016. https://www.cbsnews.com/news/googles-top-search-result-for-final-election-numbers-leads-to-fake-news-site/ (accessed September 06, 2018).
7. Hermida, A. "Tweets and truth." *Journalism Practice* 6, no. 5-6 (2012): 659-668.
8. McNair, B. *An Introduction to Political Communication.* 4th. London: Routledge, 2007.
9. Parkinson, Hannah Jane. *Click and elect: how fake news helped Donald Trump win a real election.* November 14, 2016. https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/ nov/14/fake-news-donald-trump-election-alt-right-social-media-tech-companies (accessed September 05, 2018).
10. Read, Max. *Donald Trump Won Because of Facebook.* November 09, 2016. http://nymag.com/selectall/2016/11/donald-trump-won-because-of-facebook.html (accessed September 05, 2018).
11. Uberti, David. *The Real History of Fake News.* December 15, 2016. https://www.cjr.org/special_report/fake_news_history.php (accessed September 05, 2018).
12. Wang, Amy B. *'Post-truth' named 2016 word of the year by Oxford Dictionaries.* November 16, 2016. https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/11/16/post-truth-named-2016-word-of-the-year-by-oxford-dictionaries/?utm_term=.40bcd3e00b60 (accessed September 05, 2018).

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

নির্বাচন ক্যাম্পেইনে কৌশলগত রাজনৈতিক যোগাযোগ: একটি পর্যালোচনা

মোহা. মাহামুদুল হক

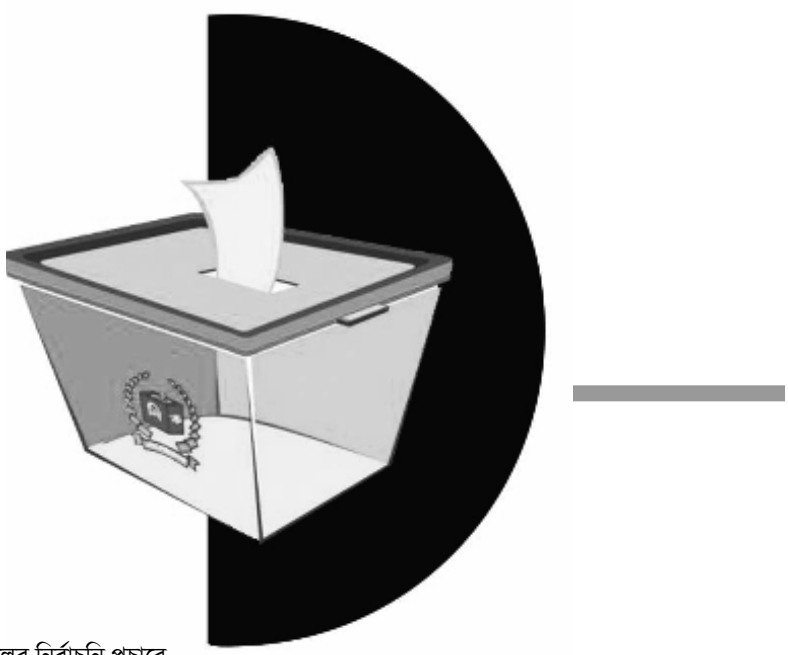

বারাক ওবামা ও তাঁর প্রতিপক্ষ মিট রমনি ২০১২ সালের নির্বাচনি প্রচারে ২.৩ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছিলেন যা ওই দেশের নির্বাচনের ইতিহাসে রেকর্ড। দুজনে প্রায় সমান সমান খরচ করেছিলেন। কিন্তু বারাক ওবামা নির্বাচনে জিতেছিলন। জয়ী হওয়ার প্রধানতম কারণ ছিল তিনি কৌশলগত নির্বাচন ক্যাম্পেইন (strategic election campaign) পরিচালনা করেছিলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্কুলের অধ্যাপকদ্বয়ের গবেষণা এ কথাই প্রমাণ করে (Chung & Zhang, 2015)। তাঁরা এ কৌশলগত নির্বাচন ক্যাম্পেইনকে বলেছেন 'Wise marketing investments'। কৌশলগত নির্বাচন ক্যাম্পেইন চালিয়ে ভোটারদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন বারাক ওবামা। ওই নির্বাচনে ফেসবুক এবং টুইটার প্রচারমাধ্যম হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। বাংলাদেশেও সোশ্যাল মিডিয়া যে কোনো বিষয় প্রচারে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এদেশে নির্বাচন ক্যাম্পেইন গতানুগতিক ও অপরিকল্পিতভাবে হয়। বর্তমান যুগে সকল কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় পরিকল্পিতভাবে ও পদ্ধতিগতভাবে। নির্বাচন ক্যাম্পেইন পরিকল্পিতভাবে ও পদ্ধতিগতভাবে হয় না। কারণ বিশেষায়িত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান এদেশে গড়ে উঠেনি। রাজনৈতিক যোগাযোগ বা নির্বাচন ক্যাম্পেইন বিশেষজ্ঞও এদেশে তেমন নেই। রাজনীতিবিদগণ এ কথা অনুধাবন করেন না যে, কৌশলগত রাজনৈতিক যোগাযোগ উদ্দেশ্যমূলক, লক্ষ্যাভিমুখী, নিরূপক ও বাস্তবিক– যা লক্ষ্য অর্জনে কার্যকরী। পদ্ধতিগত ও কৌশলগত নির্বাচন ক্যাম্পেইন জয়লাভের অন্যতম হাতিয়ার। এ নিবন্ধে কৌশলগত রাজনৈতিক যোগাযোগ ও নির্বাচন ক্যাম্পেইনের বিভিন্ন দিক, কৌশলগত রাজনৈতিক যোগাযোগ মডেল, বিভিন্ন সময়ে নির্বাচন ক্যাম্পেইনের পরিবর্তিত রূপ ও রূপায়ণ, ডিজিটাল যুগে নির্বাচন ক্যাম্পেইনের হাতিয়ার এবং বাংলাদেশে কৌশলগত রাজনৈতিক যোগাযোগ ও নির্বাচন ক্যাম্পেইনের অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক যোগাযোগ ও নির্বাচন ক্যাম্পেইন

নির্বাচন ক্যাম্পেইন হচ্ছে রাজনৈতিক যোগাযোগ। নির্বাচন ক্যাম্পেইন পরিচালনার জন্য প্রয়োজন ক্যাম্পেইন পরিচালনাকারী, স্বেচ্ছাসেবী, নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ। ক্যাম্পেইনে ঐক্য

ক্যাম্পেইনে ঐক্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজন বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সমন্বয় ও সম্পর্ক বজায়। ... ভোটারদের ভোটিং আচরণ পক্ষে আনয়নের জন্য রাজনৈতিক যোগাযোগ তথা নির্বাচন ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে তাদেরকে নিয়মিত ফোন, ই-মেইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ অন্যান্য মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হয়

নিশ্চিত করতে প্রয়োজন বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সমন্বয় ও সম্পর্ক বজায়। যোগাযোগ কৌশল প্রয়োগ করে সমর্থকদের নিকট গিয়ে তাদের মনোবল চাঙা ও শক্তিশালী করা যাতে তারা নির্বাচন ক্যাম্পেইনে সক্রিয়ভাবে কাজ করে। গণমাধ্যমে কাভারেজ অর্জন করার জন্য সম্পাদকসহ সাংবাদিকদের সাথে সখ্য গড়ে তুলতে হয়। ভোটারদের ভোটিং আচরণ পক্ষে আনয়নের জন্য রাজনৈতিক যোগাযোগ তথা নির্বাচন ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে তাদেরকে নিয়মিত ফোন, ই-মেইল, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ অন্যান্য মাধ্যমে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হয়। তাদের দোরগোড়ায় যাওয়াসহ সভা-সমাবেশে যোগদানে উদ্বুদ্ধ করতে হয়। সার্বিকভাবে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা যেমন নিজের বা দলের পক্ষে রাজনৈতিক তথ্য প্রতিবেশ, ব্র্যান্ডিংসহ কৌশলগত রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রয়োগ করতে হয়।

কৌশলগত রাজনৈতিক যোগাযোগ কী?

Stromback & Kiousis (2014) বলেছেন, "…strategic political communication is about organizationals' purposeful management of information and communication to reach political objectives it has set out for itself." রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রাজনৈতিক দল কর্তৃক উদ্দেশ্যমূলক তথ্য ও যোগাযোগের ব্যবস্থাপনাই হচ্ছে রাজনৈতিক যোগাযোগ। নির্বাচন ক্যাম্পেইনের জন্য যুগে যুগে কৌশলগত রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করা হচ্ছে। সময়ে সময়ে নতুন কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। বিশ্ব এখন গণমাধ্যমঘন রূপান্তরকাল অতিক্রম করছে। নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে নির্বাচন ক্যাম্পেইন কৌশল। রাজনৈতিক যোগাযোগের অনুষঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন সময়ের পরিবর্তনশীল নির্বাচন ক্যাম্পেইনের উপাদানগুলো Stromback & Kiousis (2014) ছকে দেখিয়েছেন।

বিভিন্ন সময়ের পরিবর্তনশীল নির্বাচন ক্যাম্পেইন

পরিবর্তনশীল নির্বাচন ক্যাম্পেইন স্তর	স্তর-১ আধুনিকতা-পূর্ব	স্তর-২ আধুনিক	স্তর-৩ উত্তর-আধুনিক
রাজনৈতিক যোগাযোগ মাধ্যম	দলকেন্দ্রিক	টেলিভিশনকেন্দ্রিক	বিভিন্ন চ্যানেল ও মাল্টিমিডিয়াকেন্দ্রিক
রাজনৈতিক যোগাযোগের প্রাধান্যশীল ব্যবস্থা	দল নির্দেশিত বার্তা প্রেরণ	শব্দ, ছবি/চিত্র ও মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা	স্থানীয় ক্যাবল টিভি ও লক্ষ্যিত ক্ষুদ্র বার্তা
প্রাধান্যশীল মিডিয়া	দল নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া, পোস্টার, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন, রেডিও'র প্রচার	প্রাইম টাইমে (সন্ধ্যায়) টিভিতে খবর প্রচার	স্থানীয় ক্যাবল টিভিতে বার্তা প্রচার, সরাসরি চিঠি ও ই-মেইল ক্যাম্পেইন
প্রাধান্যশীল বিজ্ঞাপন মিডিয়া	প্রিন্ট মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন, পোস্টার, লিফলেট, রেডিও'তে বক্তব্য প্রচার ও সমাবেশ	দেশব্যাপী টিভিতে বিজ্ঞাপন, রঙিন পোস্টার, ম্যাগাজিনে বিজ্ঞাপন ও চিঠিপত্র প্রেরণ	লক্ষ্যিত টিভি বিজ্ঞাপন, ই-মেইল ক্যাম্পেইন, টেলি-মার্কেটিং ও ওয়েবভিত্তিক বিজ্ঞাপন
ক্যাম্পেইন সমন্বয়	দলীয় নেতা ও কর্মকর্তাগণ	দলীয় ক্যাম্পেইন ম্যানেজার, জরিপ বিশেষজ্ঞ, মিডিয়া ও বিজ্ঞাপন	দলীয় বিশেষ ইউনিট ও অধিক বিশেষায়িত রাজনৈতিক কনসালট্যান্ট
প্রাধান্যশীল ক্যাম্পেইন প্যারাডাইম	দলীয় যুক্তি	মিডিয়া ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি	মার্কেটিং কৌশল ব্যবহার পক্ষে যুক্তি
ক্যাম্পেইন প্রস্তুতি	স্বল্পমেয়াদি ক্যাম্পেইন	দীর্ঘমেয়াদি ক্যাম্পেইন	স্থায়ী ক্যাম্পেইন
ক্যাম্পেইন ব্যয়	কম	ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত	খুবই বেশি

Storm (1990) প্রাথমিক উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলোকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। ক. পলিসি– অন্বেষণকারী রাজনৈতিক দল যাদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য থাকে পাবলিক পলিসির ওপর প্রভাব বিস্তার করা। খ. দপ্তর– অন্বেষণকারী রাজনৈতিক দল যারা রাজনৈতিক দপ্তরের নিয়ন্ত্রণ চায় বেশি। গ. ভোট– অন্বেষণকারী রাজনৈতিক দল যারা নির্বাচন ক্যাম্পেইন ও রাজনৈতিক যোগাযোগে গুরুত্ব দেয় বেশি। সরাসরি ভোট ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ভোটারদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করার চেষ্টা করে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মার্কেটিংয়ের তত্ত্বানুযায়ী আরেকভাবে রাজনৈতিক দলগুলোকে বিভাজন করা হয়। যথা- পণ্যভিত্তিক, বিক্রয়ভিত্তিক ও মার্কেটিংভিত্তিক রাজনৈতিক দল। পণ্যভিত্তিক রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক পণ্য যেমন দলের রাজনৈতিক নীতি-আদর্শের অবস্থান জানান দেয়। এরা মনে করে যে, ভোটারগণ তাদের নীতি-আদর্শ অনুধাবন করে ভোট দেবে। এ ধরনের রাজনৈতিক দলকে পলিসি-অন্বেষণকারী রাজনৈতিক দলও বলা হয়।

বিক্রয়ভিত্তিক রাজনৈতিক দল পণ্যভিত্তিক রাজনৈতিক দলের মতোই। এরাও অভ্যন্তরীণ আদর্শ ও বিশ্বাস বিক্রয় করতে চায়। দলের আদর্শ বিক্রয় করার জন্য মার্কেটিং কৌশল প্রয়োগ করে। নির্বাচন ক্যাম্পেইন ও ক্যাম্পেইন যোগাযোগের ওপরও গুরুত্ব দেয়। এরাও পলিসি অন্বেষণকারী ও ভোট অন্বেষণকারী রাজনৈতিক দল। মার্কেটিংভিত্তিক রাজনৈতিক দল মার্কেটিংয়ের জ্ঞান শুধু কার্যকরী নির্বাচন ক্যাম্পেইন পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োগ করে না, রাজনৈতিক পণ্য হিসেবে এর নীতি-আদর্শও মার্কেটিং করে। জনগণ কী চায়, তা অনুসন্ধান করে ও বাস্তবায়ন করে এসব মার্কেটিংভিত্তিক রাজনৈতিক দল।

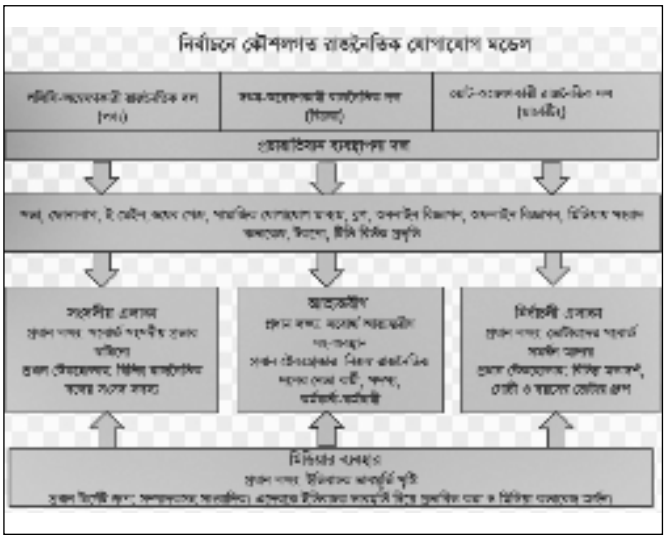

ক্যাম্পেইন যোগাযোগের প্রধান বিষয় হলো এর বাস্তবতা অনুধাবন। যথাযথ লক্ষ্য স্থির করা যাতে নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায়। কৌশলগত নির্বাচন ক্যাম্পেইন পরিচালনার জন্য রাজনৈতিক যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ও পেশাদার রাজনৈতিক যোগাযোগ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্তি বর্তমান যুগে অপরিহার্য। বারাক ওবামার নির্বাচনে রাজনৈতিক যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ দল ও এমন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দুবার নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

নির্বাচন ক্যাম্পেইন কৌশল নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পথ প্রদর্শন করে। কারা ভোট দেবে, কেন ভোট দেবে, কারা ভোট দেবে না, কেন ভোট দেবে না এবং যেসব ভোটার ভোট দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়নি– এমন ভোটার গ্রুপ চিহ্নিত করতে হবে। দেখতে হবে মোট ভোটার কত, কত ভোট নিজের বা দলের পক্ষে, কত ভোট প্রতিপক্ষে এবং কত ভোট সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যে রয়েছে, তার পরিসংখ্যান বের করতে হবে। এজন্য জরিপ পরিচালনা করা প্রয়োজন। পূর্বের জরিপের ফলও এক্ষেত্রে কাজে লাগানো যায়। কত ভোট হলে জয় নিশ্চিত হবে তাও বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। জয়ী হওয়ার জন্য প্রত্যেক ভোটারের ভোট পেতে হবে তা নয়। তবে সকল ভোটারের কাছে যেতে হয় বা ক্যাম্পেইন বার্তা পৌঁছে দিতে হয়। সব মিলিয়ে একটা নির্বাচন ক্যাম্পেইন কৌশল প্রণয়ন করে নির্বাচনের মাঠে নামতে হয়। কার্যকরী রাজনৈতিক যোগাযোগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে হয়।

ডিজিটাল যুগে নির্বাচন ক্যাম্পেইন ও প্রথম 'ইন্টারনেট প্রেসিডেন্টের' সাফল্য

২০০৭ সালের প্রথমদিকে আফ্রিকান-আমেরিকান বারাক ওবামা খুবই কম পরিচিত সিনেটর ছিলেন। এমনকি ৫০ বছর আগে বাসে সাদা চামড়ার মানুষের পাশে বসতে পারতেন না তিনি। ডেমোক্রেটিক পার্টির আরেক সিনেটর হিলারি ক্লিনটন ব্যাপক পরিচিত ছিলেন। দুজনেই প্রেসিডেন্ট পার্থী হিসেবে পার্টির নমিনেশনের জন্য লড়াই করছিলেন। ২০০৮ সালের আগস্টে ওবামা ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হন। ওই বছর ৪ নভেম্বর ৪৭ বছর বয়স্ক ওবামা রিপাবলিকান প্রার্থী জন ম্যাককেইনকে হারিয়ে ৪৪তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এ সফলতার অন্যতম মাধ্যম ছিল সোশ্যাল মিডিয়াসহ প্রযুক্তিনির্ভর ক্যাম্পেইন। নির্বাচন ক্যাম্পেইনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রযুক্তির ব্যবহার। এজন্য বারাক ওবামাকে প্রথম 'ইন্টারনেট প্রেসিডেন্ট' বলা হয় (Greengard, 2009)। তাঁর ক্যাম্পেইনের নাম ছিল 'Yes we can'। ১৯৯২ সালে বিল ক্লিনটনের নির্বাচন ক্যাম্পেইনে প্রথম ইন্টারনেট ব্যবহৃত হয়েছিল কিন্তু তা সীমিত আকারে। শুধু ই-মেইল ও তথ্য-বার্তা পাঠানো হতো ভোটারদের নিকট।

প্রথাগত ক্যাম্পেইন মূলত ভোটারদের নিকট ভোট চায়। ওবামার ক্যাম্পেইন দল আরেকটি অনুষঙ্গ যোগ করে, তা হচ্ছে ভোটারদের ক্যাম্পেইন প্রক্রিয়ার সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি ও সংযুক্তকরণ (involvement and engagement)। তাঁর ই-মেইল প্রেরণকারী দলের লক্ষ্য ছিল তিনটি: বার্তা প্রেরণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও অর্থ সংগ্রহ। ই-মেইল টেক্সটে ভোটারদের তিনটি বিষয়-সম্মান প্রদর্শন, ক্ষমতায়ন ও সংযুক্তকরণের প্রচেষ্টা থাকত। Barackobama.com নামক ওয়েবসাইট, সোশ্যাল মিডিয়া, ই-মেইল, ইউটিউব ভিডিওসহ প্রযুক্তির সম্মিলিত ব্যবহার ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করেছিল। সোশ্যাল মিডিয়া ছিল অন্যতম ক্যাম্পেইন হাতিয়ার। শেষ পর্যন্ত জয়ী হওয়ার পরও সোশ্যাল মিডিয়ায় ওবামার ঘোষণা অব্যাহত ছিল। জয়ের পর ওবামা টুইটার বার্তায় জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন: 'All of this happened because of you. Thanks, Barack.'

ওবামার ক্যাম্পেইন দল দেখিয়েছে কীভাবে প্রযুক্তি 'transformative force' হিসেবে কাজ করে। Blue State Digital এর Jascha Franklin বলেন: 'The campaign understood the power of the internet to get people engage in the process on a scale never done before' (Talbot, 2009).

এসব ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেছে যোগাযোগ ও ক্যাম্পেইন বিশেষজ্ঞগণ এবং AKPD Message and Media নামক রাজনৈতিক ও মিডিয়াবিষয়ক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান।

বাংলাদেশে নির্বাচন ক্যাম্পেইন

বাংলাদেশে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, উন্নয়ন করলেই ভোট পাওয়া যায়। কিন্তু ভোটিং আচরণ নির্ভর করে অনেক বিষয়ের ওপর। উন্নয়ন একটা অনুষঙ্গ মাত্র। যথাযথ রাজনৈতিক যোগাযোগ ছাড়া ভোটিং আচরণ পরিবর্তন করা সহজ নয়। কারণ যোগাযোগে সবচাইতে কঠিন কাজ হলো মানুষের আচরণ পরিবর্তন। একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যায়। ২০১৩ সালে রাজশাহী সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী খায়রুজ্জামান লিটন পরাজিত হন এবং বিএনপি প্রার্থী মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল জয়ী হন। এর আগে খায়রুজ্জামান লিটন মেয়র ছিলেন (সময়কাল ১৪.০৯.০৮-০৯.০৫.'১৩)। তিনি মেয়র থাকা অবস্থায় রাজশাহী নগরীকে আধুনিক নগরীতে পরিণত করেছিলেন। কেননা, রাজশাহী এত সুন্দর নগরী ছিল না। বর্তমান দৃষ্টিনন্দন রাজশাহী নগরী গড়ে তোলা তাঁরই অবদান। এরপরেও খায়রুজ্জামান লিটন পরাজিত হয়েছিলেন। কারণ হচ্ছে শুধু উন্নয়ন করেই নির্বাচনে জয়লাভ করা যায় না। নির্বাচনে জয়লাভ করার জন্য যথাযথ রাজনৈতিক যোগাযোগ কৌশল প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়। ২০১৩ সালে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জাতীয় রাজনীতির প্রভাব পড়েছিল। বিশেষ করে হেফাজতের ঘটনাকে ইস্যু করে ভোটারদের মাঝে সরকার সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করা হয়েছিল। এসব নেতিবাচক প্রোপাগান্ডা কাউন্টার প্রচার কৌশল তথা রাজনৈতিক যোগাযোগ কৌশল প্রয়োগ করে প্রতিহত করা সম্ভব ছিল।

বাংলাদেশে নির্বাচন ক্যাম্পেইন পরিচালিত হয় গতানুগতিক পদ্ধতিতে। রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা-কর্মীদের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা ইউনিট থাকে। এসব ইউনিটে জনসংযোগ/মিডিয়া কর্মকর্তাও থাকেন যারা গণমাধ্যমের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখেন ও দলের পক্ষে মিডিয়া কাভারেজ পেতে চেষ্টা করেন। রাজনৈতিক যোগাযোগ বা নির্বাচন ক্যাম্পেইন বিশেষজ্ঞ বলতে তেমন কোনো বিশেষজ্ঞ থাকে না এসব ইউনিটে। তবে কখনো কখনো বড়ো রাজনৈতিক দল নির্বাচনের সময় বিদেশ থেকে নির্বাচন ক্যাম্পেইন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেয়। কিন্তু এদেশের ভোটিং আচরণ সম্পর্কে ধারণা থাকে না তাদের। দেশীয় বিশেষজ্ঞ ছাড়া ভোটের সংস্কৃতি বোঝা কঠিন। আর প্রার্থীরা পরিকল্পনা ছাড়াই গতানুগতিক পদ্ধতিতে নিজের মতো করে নির্বাচন ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেন। কোনো প্রতিষ্ঠান বা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে কৌশলগত নির্বাচনি ক্যাম্পেইন এখনো কোনো প্রার্থী করেননি। নির্বাচনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে একজন প্রার্থী। কিন্তু কৌশলগত নির্বাচন পরিচালনার জন্য বিশেষজ্ঞ দলের প্রয়োজন এখনো অনুধাবন করতে পারছেন না তাঁরা। কারণ দেশে কৌশলগত রাজনৈতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যয়ের সংস্কৃতি গড়ে উঠেনি। তবে এ কথা সত্য যে, যথাযথ বিশেষজ্ঞ পাওয়াও মুশকিল।

রাজনৈতিক যোগাযোগ ও নির্বাচন ক্যাম্পেইন বিষয়টি বিশেষায়িত ধারণা। উন্নত রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যোগাযোগ বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মার্কেটিং বিভাগগুলোতে পঠিত হয় রাজনৈতিক যোগাযোগ ও নির্বাচন ক্যাম্পেইন বিষয়টি। কিন্তু বাংলাদেশে একাডেমিক পর্যায়েও রাজনৈতিক যোগাযোগ বা নির্বাচন ক্যাম্পেইনের ওপর গবেষণা বা পঠনপাঠন তেমন হয় না। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ হচ্ছে রাজনৈতিক যোগাযোগ ও নির্বাচন ক্যাম্পেইন পাঠদানের এক ধরনের সেমি-বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো বিশেষ কোর্স পড়ানো হয় না। যোগাযোগ, মিডিয়া ও সাংবাদিকতার বিষয়গুলো পড়ানো হয় যা রাজনৈতিক যোগাযোগ ও নির্বাচন ক্যাম্পেইনের অনুষঙ্গগুলো বোঝার জন্য সহায়ক। দেশে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানও নেই। রাজনৈতিক যোগাযোগ বা নির্বাচন ক্যাম্পেইনে সহায়তা করার জন্য কোনো পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। বাংলাদেশে নলেজ ইন্ডাস্ট্রি নামে একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনি ক্যাম্পেইন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। হয়তো একদিন শত শত এমন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে দেশে। রাজনৈতিক যোগাযোগ বা নির্বাচন ক্যাম্পেইন পেশাদারিত্ব অর্জন করবে।

তথ্যসূত্র

1. Chung, Dugh J. I Zhang, Lingling (2015). Selling to a Moving Target: Dynamic Marketing Effects in US Presidential Elections, Working Paper, Harvard Business School, Harvard University.
2. Strömbäck, J. & Kiousis, S. (2014). Strategic political communication in election campaigns. In: *Political Communication* (pp. 109-128). Berlin, Boston: DE GRUYTER. [Online] Available at https://www. degruyter.com/ view/books/ 9783110238174/9783110238174.109/9783110238174.109.xml , Retrieved on 9 Oct 2018.
3. Talbot, David (2009). 'White House 2.0', The Boston Globe, January 11, 2009.
4. Greengard, S (2009). The first internet President, Ed Communications of the ACM, Vol 52, No. 2, p-16-18.

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক, গবেষক ও যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ

নির্বাচনবিষয়ক সংবাদঃ ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ

আমীন আল রশীদ

নির্বাচন হচ্ছে সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক খেলা। সুতরাং সেই খেলায় যাতে সংঘর্ষ, নৈরাজ্য সৃষ্টি না হয় এবং খেলাটি যাতে ভণ্ডুল না হয়, সেজন্য যে রেফারির প্রয়োজন, তার নাম নির্বাচন কমিশন। সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনার জন্য সংবিধান ও আইন নির্বাচন কমিশনকে যেসব ক্ষমতা দিয়েছে, তারা সেটির কতটা প্রয়োগ করছে বা করতে পারছে– তার ওপর নির্ভর করে ভোট কতটা অবাধ ও সুষ্ঠু হবে। চোখে আঙুল দিয়ে এই রেফারির ভুলগুলো ধরিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব গণমাধ্যমের। অর্থাৎ সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করার দায়িত্ব গণমাধ্যমের না হলেও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের ওপর নজরদারি করে গণমাধ্যম।

একটি নির্বাচন কেমন হবে, তার পুরোটাই নির্ভর করে যে সরকারের অধীনে নির্বাচন হচ্ছে, তারা নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করার ব্যাপারে কতটা আন্তরিক, তার ওপর। সেই সঙ্গে নির্বাচনের যারা মূল পক্ষ, অর্থাৎ রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী– তাদের আচরণের ওপরও নির্ভর করে ভোটের মাঠের পরিবেশ কেমন থাকবে। তবে গণমাধ্যমের দায়িত্ব হচ্ছে ঘটনা যা, সেটিই লেখা ও দেখানো। গণমাধ্যম যদি যা ঘটছে, ঘটেছে এবং ঘটার আশঙ্কা রয়েছে– সেগুলো নির্ভয়ে এবং পেশাদারিত্বের সঙ্গে প্রকাশ ও প্রচার করতে পারে, তাহলে সঠিক চিত্র সাধারণ মানুষ জানতে পারে। তখন অবাধ, সুষ্ঠু, গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন এবং সরকারের ওপর একধরনের নৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়। গণমাধ্যমের মূল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে এ নৈতিক চাপে রাখা। আর গণমাধ্যম তখনই অন্যের ওপর নৈতিক চাপ প্রয়োগের অধিকারী হয়, যখন সে নিজের প্রতিষ্ঠানে পেশাদারিত্ব ও সততার চর্চা করে।

নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং অন্য রিপোর্টের চেয়ে ভিন্ন। কারণ এখানে ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ তুলনামূলক বেশি। এ সময় সাংবাদিকের আসল ঝুঁকি নির্বাচনি সহিংসতার সংবাদ ও ছবি সংগ্রহ করতে গিয়ে হতাহত হওয়া। আর মূল চ্যালেঞ্জ সঠিক তথ্যটি মানুষকে জানানো। অনেক সময় সাংবাদিক যা দেখেন এবং যা জানেন তার সবটুকু তিনি মানুষকে জানাতে পারেন না। তার ওপর নানা মহলের চাপ থাকে। সেই চাপ মোকাবিলা করে সঠিক চিত্রটি মানুষকে জানানোই মূল চ্যালেঞ্জ।

নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং অন্য রিপোর্টের চেয়ে ভিন্ন। কারণ এখানে ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ তুলনামূলক বেশি। ... অনেক সময় সাংবাদিক যা দেখেন এবং যা জানেন তার সবটুকু তিনি মানুষকে জানাতে পারেন না। তার ওপর নানা মহলের চাপ থাকে। সেই চাপ মোকাবিলা করে সঠিক চিত্রটি মানুষকে জানানোই মূল চ্যালেঞ্জ

রিপোর্টের ইস্যু

ভোট গ্রহণের আগে প্রার্থীরা নির্বাচনি হলফনামায় যেসব তথ্য দেন, যেমন– তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, মামলা, সম্পদের বিবরণ ইত্যাদি নিয়ে অনেক চমৎকার রিপোর্ট হয়। আবার নির্বাচনে প্রার্থীদের যে ব্যয়ের সীমা, সেটিও বড়ো সংবাদের উৎস। অর্থাৎ অধিকাংশ প্রার্থীই যেহেতু এই নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেন এবং কেউ কেউ নির্ধারিত সীমার ১০ গুণও খরচ করেন, ফলে সাংবাদিকদের এটি একটি বড়ো অনুসন্ধানের জায়গা। দেখা যায়, অনেক প্রার্থী তার জন্য নির্ধারিত বাজেটের পুরোটাই খরচ করেন পোস্টার ও লিফলেট তৈরিতে। তাহলে বাকি অর্থ কোথা থেকে আসে বা কোথায় কোথায় খরচ হয়? এক্ষেত্রে সাংবাদিকরা বিভিন্ন প্রেসে গিয়ে অনুসন্ধান চালাতে পারেন যে, কোন প্রার্থী কত লাখ টাকার পোস্টার ও লিফলেট ছাপালেন। এর বাইরে বিভিন্ন পথসভাসহ নানা খাতে যে খরচ করেন, তার পুরোটাই একটি নির্ধারিত ব্যাংক হিসাব থেকে খরচ করার কথা। কিন্তু অধিকাংশ প্রার্থীই এই নিয়ম ভঙ্গ করেন। এসবের বিরুদ্ধে রিটার্নিং কর্মকর্তা কী ব্যবস্থা নিলেন বা আদৌ নিলেন কি না, সেটিও অনেক বড়ো রিপোর্টের বিষয় হতে পারে।

বড়ো প্রার্থীকে ফলো করলে সেখান থেকে অনেক সংবাদের উপাদান পাওয়া যায়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় যেমন বলা হয় 'ফলো দ্য মানি'। সেরকম জাতীয় নির্বাচনেও 'ফলো দ্য হেভিওয়েট'।

একটি জাতীয় নির্বাচনে সরকারের ৬০০ থেকে ৭০০ কোটি টাকা খরচ হয়। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই খরচ হয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পেছনে এবং বাকি একাংশ নির্বাচনি ব্যবস্থাপনায়। এ বিশাল অঙ্কের টাকা কোথায়-কীভাবে খরচ হলো, তার জবাবদিহিতা কী, এ অর্থ খরচের সঠিক অডিট হয় কি না, অডিট আপত্তি এসেছে কি না, এলে সে বিষয়ে সংসদের সরকারি হিসাব কমিটি কী ব্যবস্থা নিয়েছে ইত্যাদি নিয়ে অনেক অনুসন্ধানী রিপোর্ট করা যায়।

এথিক্যাল জার্নালিজম

বলা হয়, গণমাধ্যম 'এথিক্যাল জার্নালিজম' করবে। আর এথিক্যাল জার্নালিজমের মানে হলো 'ফেয়ার অ্যান্ড ব্যালান্সড জার্নালিজম'। কিন্তু এই ফেয়ার অ্যান্ড ব্যালান্সড মানেই কি সবকিছুর প্রকাশ ও প্রচার? কোনো তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ফলে যদি কোথাও বড়ো ধরনের সহিংসতা তৈরির আশঙ্কা থাকে, গণমাধ্যম কি সেই তথ্য প্রচার করবে? ধরা যাক, কোনো এক প্রার্থী সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক কোনো বক্তব্য দিলেন। সেটি হয়তো খুব কম মানুষই শুনেছেন। এখন গণমাধ্যম যদি ওই বক্তব্যের ভিডিও প্রচার করে দেয় এবং তার ফলে সারা দেশে ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি হয় বা তৃতীয় কোনো পক্ষ সেই সুযোগে সাম্প্রদায়িক সংঘাত বাধানোর পাঁয়তারা করে, তখন কী হবে? ফলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা মানে সবকিছু প্রকাশ ও প্রচার করা নয়। এ কারণে নির্বাচনের মতো অতি স্পর্শকাতর ইস্যুতে তাকে অধিকতর সতর্ক থাকতে হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, রিটার্নিং বা প্রিসাইডিং অফিসার নিশ্চিত করার আগেই ব্যক্তিগত সূত্র (প্রার্থীর দলীয় অফিস, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা) থেকে পাওয়া ফল ঘোষণা করে দেওয়া হয়। হয়তো অনেক সময়ই ওইসব ব্যক্তিগত উৎসের খবর সঠিক, কিন্তু প্রিসাইডিং ও রিটার্নিং অফিসার নিশ্চিত করার আগে ফল প্রকাশ করা পেশাদার আচরণ নয়। কিন্তু তারপরও বেসরকারি টেলিভিশনগুলোর মধ্যে যেহেতু একধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতা চলে, সে কারণে অনেক সময় সাংবাদিকরা যেখান থেকে তথ্য পান, সেটিই প্রচার করে দেন। কখনো এই তথ্য ভুলও প্রমাণিত হয়। তখন গণমাধ্যমের দায়বদ্ধতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

এ কারণে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকীয় নীতি আগেই ঠিক করে রাখা দরকার। যদি বিশেষ কোনো দলের বা প্রার্থীর প্রতি প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা থাকে, তাহলে সেটি মাঠপর্যায়ের রিপোর্টারকে আগেভাগেই সে ব্যাপারে অবহিত এবং সতর্ক করা প্রয়োজন। যদিও কোনো দল ও প্রার্থীর পক্ষাবলম্বন কাঙ্ক্ষিত নয়। কিন্তু এখনো যেহেতু আমাদের সাংবাদিকতা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় স্বাধীন ও পেশাদার হয়ে উঠতে পারেনি, ফলে নির্বাচনবিষয়ক সংবাদ সংগ্রহকালে অনেক বাস্তবতা মাথায় রাখতে হয়।

সুরক্ষা পরিকল্পনা

নির্বাচনের বাস্তবতা তিন সময়ে তিন ধরনের। যেমন– নির্বাচন-পূর্ববর্তী, নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন-পরবর্তী। ফলে নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের ধরনও হয় আলাদা। তবে ভোট গ্রহণের দিন ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি এবং সংগত কারণে এদিনের প্রস্তুতিও বেশি থাকতে হয়। বিশেষ করে যদি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো শক্তিশালী ও মারমুখী হয় এবং সংঘাতের আশঙ্কা থাকে। যে কারণে বলা হয় সেফটি ফার্স্ট, অর্থাৎ সাংবাদিকের নিজের সুরক্ষা আগে। পাশাপাশি তাদের ক্যামেরা, ট্রাইপডসহ অন্যান্য সরঞ্জামও নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখতে হয়। টেলিভিশনের ক্যামেরা ও ট্রাইপড বেশ ভারি। ফলে বিপদের মুহূর্তে এসব নিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে দৌড়ে যাওয়া বেশ চ্যালেঞ্জিং। ফলে শারীরিকভাবে শক্তিশালী কর্মীদেরই ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রে পাঠানো উচিত। কাকে কোন এলাকায় নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহে পাঠানো হবে, তা ভোটের অনেক আগেই ঠিক করে রাখা দরকার এবং কোন এলাকায় সুরক্ষা পরিকল্পনা কী হবে, সে বিষয়ে একটি গাইডলাইন তৈরি করা দরকার।

স্থানীয় নির্বাচন বিভিন্ন সময়ে হয় বলে এখানে গণমাধ্যমের নজদারি সহজ। আবার স্থানীয় নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের ওপর যেহেতু সরকারের পরিবর্তন নির্ভর করে না, ফলে এখানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে হস্তক্ষেপের আশঙ্কাও কম থাকে। কিন্তু জাতীয় নির্বাচন হয় একদিনে (ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একাধিক দিনে ভোট হয়) এবং সারা দেশের ৩০০ আসনে নজরদারি করা যেহেতু গণমাধ্যমের জন্য একেবারেই অসম্ভব, ফলে একদিনে সব স্থানে সাংবাদিক পাঠানো এবং তাদের প্রয়োজনীয় লজিস্টিক সাপোর্ট দেয়াও সম্ভব নয়। নির্বাচনি সংবাদ কাভারের ক্ষেত্রে এটিও একটি চ্যালেঞ্জ।

গণমাধ্যম মূলত গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলোয়, অর্থাৎ যেসব আসনে হেভিওয়েট প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, সেখানে তাদের রিপোর্টারদের পাঠায়। ফলে একটি বিরাট অংশই ক্যামেরার বাইরে থাকে। সেসব জায়গায় যদি অনিয়ম-দুর্নীতি হয়, অনেক সময় তা মানুষের অজানাই থাকতে পারে। স্থানীয় পর্যায়ের সংবাদপত্রের কর্মীরাও যে সবসময় নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন বা করেন, এমনও নয়। অনেক সময় তারা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে ব্যর্থ হন।

ব্ল্যাকমেইলিংয়ের ঝুঁকি

নির্বাচনবিষয়ক সংবাদে সাংবাদিকদের জন্য একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ নির্বাচন কর্মকর্তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সঠিক সময়ে না পাওয়া। বিশেষ করে ভোটে যখন অনিয়ম হয়, তখন তারা স্বভাবতই সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলেন। এর বাইরে বিভিন্ন মহলের হুমকি, নিরাপত্তাহীনতা, প্রার্থীর ফাঁদে পা দেওয়ার মতো ঝুঁকিও থাকে। এক্ষেত্রে ২০১৮ সালে খুলনা ও বরিশাল সিটি করপোরেশন নির্বাচনের দুটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যায়। খুলনায় একজন প্রার্থী সাংবাদিকদের প্রভাবিত করার জন্য অনেককে খামে ভরে টাকা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এর মধ্যে একজন সাংবাদিক এ ঘটনার প্রতিবাদ করেন এবং টাকা গ্রহণ না করে ওই প্রার্থীর অনিয়মের ব্যাপারে সংবাদ প্রকাশ করেন। কিন্তু ওই প্রার্থীর পক্ষ থেকে সাংবাদিককে ফোন করে বলা হয়, তিনি যে টাকা নিয়েছেন, তার সিসিটিভির ফুটেজ আছে। তার মানে হলো, পুরো বিষয়টিই পরিকল্পিত। ওই প্রার্থী সাংবাদিকদের ব্ল্যাকমেইল করার জন্য এমন একটি জায়গায় বসে টাকাভর্তি খাম ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, যেটি সিসিটিভির আওতায় আছে।

একটি বেসরকারি টেলিভিশনের একজন রিপোর্টার, যিনি বরিশাল সিটি নির্বাচন কাভার করতে গিয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে হেড অফিসে নালিশ আসে এক মেয়র প্রার্থীর পক্ষ থেকে যে, তিনি তাকে (প্রার্থী) কাভার করছেন না। হেড অফিস থেকে এর কারণ জানতে চাইলে ওই রিপোর্টার জানান, অভিযোগকারী প্রার্থী তাকে (রিপোর্টার) টাকা অফার করেছিলেন। তিনি এটি না নেওয়ায় তার বিরাগভাজন হয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, প্রার্থীদের অনেকে সাংবাদিকদের এভাবে বাগে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে তাদের রোষানলে পড়তে পারেন। অনেক সময় ব্ল্যাকমেইলিংয়েরও শিকার হতে পারেন। নির্বাচনের সময় এই ঝুঁকি অনেক বেশি।

মোকাবিলার উপায়

নির্বাচনবিষয়ক সংবাদ কাভারে ঝুঁকি মোকাবিলার কৌশল নির্ভর করে ঝুঁকির ধরনের ওপর। এ কারণে বলা হয়, পরিস্থিতিই বলে দেয় কখন কী করতে হবে। বিশেষ করে যখন কোথাও সংঘাত শুরু হয়, তখন অনেক একাডেমিক জ্ঞান কাজে না-ও লাগতে পারে। সাংবাদিকের গায়ে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট আর মাথায় হেলমেট থাকলেও পায়ে এসে গুলি লাগতে পারে। সুতরাং কোন পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, সেটি নির্ভর করে পরিস্থিতির ভেতরে থাকা সাংবাদিকের কাণ্ডজ্ঞান, উপস্থিত বুদ্ধি, সাহসিকতা ও কৌশলের ওপর।

অনেক সাহসী মানুষও কৌশলের অভাবে বিপদগ্রস্ত হতে পারেন। অনেক ভীতু লোকও সুকৌশলে বিপদ এড়িয়ে নিজেকে বাঁচাতে পারেন। ফলে কার সেফটি প্ল্যান বা সুরক্ষা কৌশল কী হবে, সেটি প্রথমত নির্ভর করে তার নিজের ওপর। এর বাইরেও মোটা দাগে কিছু বিষয় মাথায় রাখা জরুরি। যেমন–

১. পরিস্থিতি বোঝা দরকার। কারা ঝুঁকি তৈরি করতে পারে তার একটা সম্ভাব্য তালিকা করা গেলে সুরক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ সহজ হয়।
২. নির্বাচনকালীন অর্থাৎ ভোটের দিনের সংবাদ সংগ্রহকালে একা কোথাও না যাওয়া। বরং দলবদ্ধভাবে সাংবাদিকরা কেন্দ্রে গেলে সেটি তাদের মধ্যে একধরনের আত্মবিশ্বাস তৈরি করে। ঝুঁকির মাত্রা কমায়। কেউ হয়তো এক্সক্লুসিভ ছবি বা তথ্য সংগ্রহের জন্য একাই যেতে চাইবেন, কিন্তু সেখানেও মাথায় রাখা দরকার, কোনো ঝামেলা তৈরি হলে তিনি যেন একা হয়ে না পড়েন। যেন এমন একটি জায়গায় থাকেন, যেখানে দ্রুত তার অন্য সহকর্মীরা পৌঁছতে পারেন। কেননা দলছুট হয়ে গেলে বিপদের আশঙ্কা বাড়ে।
৩. নির্বাচনি সংবাদ সংগ্রহকারী প্রত্যেকের সঙ্গে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ও হেলমেট থাকা জরুরি। একসঙ্গে সারা দেশের ৩০০ আসনের সব সাংবাদিককে হয়তো এই জ্যাকেট ও হেলমেট দেওয়া বাস্তবসম্মত নয়, কিন্তু যেসব জায়গায় সংঘাতের আশঙ্কা রয়েছে, সেসব জায়গায় সাংবাদিকের শারীরিক নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাগ্রে বিবেচনায় রাখতে হবে।
৪. ভোটের দিন দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া জরুরি। সব প্রতিষ্ঠানেরই একাধিক টিম থাকবে। সেক্ষেত্রে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রার্থীকে দুজন, রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে একজন, নির্বাচন কমিশনে একজন এবং ভ্রাম্যমাণ থাকে আরও কয়েকটা ইউনিট। আর কেন্দ্রীয়ভাবে একজন সমন্বয়কারী। এতে কাজের ক্ষেত্রে সমন্বয় সহজ হয়।
৫. কোনো একটি কেন্দ্রে জাল ভোট, মারামারি বা অনিয়ম দেখেই সারা দেশের ভোট সম্পর্কে উপসংহারে পৌঁছানো যাবে না। বরং যেখানে যতটুকু ঘটনা, ততটুকু বলা, লেখা এবং দেখানোই গণমাধ্যমের বস্তুনিষ্ঠতা। কেননা তথ্যে রং চড়িয়ে অধিক আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হলে টেলিভিশন ও ইন্টারনেটের কল্যাণে দ্রুত সেই তথ্য সর্বত্র ছড়িয়ে যাবে এবং পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যেতে পারে। ফলে যতটা সম্ভব সংযত থাকা। বিশেষ করে লাইভে যখন কোনো কেন্দ্রের বিবরণ দেয়া হয়, তখন সেখানে শব্দ চয়নে বেশ সতর্ক থাকা জরুরি।
৬. কতটুকু প্রকাশ বা প্রচার করা যাবে, তা ভেবে সাংবাদিকের আগেভাগেই ডিফেন্সিভ হয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। বরং যা তিনি যা দেখবেন সবই নোট নেবেন, এবং যত বেশি সম্ভব ছবি নেবেন। অফিসকে প্রতিনিয়ত সব তথ্য দিয়ে তিনি আপডেট রাখবেন। প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকীয় নীতি ও কৌশল অনুযায়ী সব সময় সব তথ্য ও ছবি হয়তো প্রকাশ ও প্রচার করা যাবে না। কিন্তু সেগুলো গণমাধ্যমের সংগ্রহে থাকবে– যা হয়তো একসময় ইতিহাসের সাক্ষী হবে। এ কারণে সব গণমাধ্যমপ্রতিষ্ঠানেই শক্তিশালী আর্কাইভ বা সংগ্রহশালা গড়ে তোলার ওপরে জোর দেওয়া হয়।
৭. ভোটের দিন ঘটনাস্থলে ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের সংযোগ ভালো পাওয়া না গেলে অফিস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, যা অনেক সময় মাঠপর্যায়ে সংবাদ কাভার করতে যাওয়া সাংবাদিকদের জন্য নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করতে পারে। সেক্ষেত্রে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট সচল না থাকলে বিকল্প কী উপায়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা যাবে– সেটি আগেভাগেই ঠিক করে রাখা।

ভোটপরবর্তী দিনের পরিকল্পনা

ভোটের দিনের পরিকল্পনা হয়তো ভালো মতোই করা হয়। কিন্তু ভোটের পরের দিনের পরিকল্পনা থাকে না। অথচ ফল ঘোষণার পরই অনেক জায়গায় সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। আবার অনেক মজার ঘটনাও ঘটে। যেমন বিজয়ী প্রার্থী ফুল ও মিষ্টি নিয়ে পরাজিত প্রার্থীর বাসায় যান (২০১৮ সালে রংপুর সিটি করপোরেশনে ঘটেছে)। কিন্তু আগের দিন ব্যাপক দৌড়ঝাঁপ করে ক্লান্ত সাংবাদিক পরদিন আর মাঠে যেতে উৎসাহ বোধ করেন না। ফলে ভোট গ্রহণের পরে অর্থাৎ নির্বাচন-পরবর্তী সংবাদ কাভারের জন্য আলাদা টিম ও পরিকল্পনা থাকা দরকার।

গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম

একটি রাষ্ট্রের গণতন্ত্র কতটা সংহত, তা সে দেশের গণমাধ্যমেই ফুটে ওঠে। রাষ্ট্র যদি গণমাধ্যমের ওপর খবরদারি করে, নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে এবং সবসময় একধরনের চাপের মধ্যে রাখে অথবা গণমাধ্যমের মালিক-সম্পাদক-প্রকাশক ও সাংবাদিকরাই যদি এমন পরিস্থিতি তৈরি করেন, যাতে সরকার তাদের ওপর সরকার খবরদারির সুযোগ পায়, তখন সে দেশে গণতন্ত্র সুসংহত হওয়ার পথ সংকুচিত হতে থাকে।

যে গণমাধ্যমকে রাষ্ট্র ও গণতন্ত্রের ওয়াচডগ বলা হয়, অর্থাৎ যে কি না রেফারির কর্মকাণ্ডও নজরদারি করে, সেই গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা তাদের সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে কতটা বস্তুনিষ্ঠ, তারা নীতির প্রশ্নে কতটা অবিচল, কতটা পেশাদার, কতটা নির্ভয়, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। যে গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের মালিক নিজেই কালো টাকার মালিক, দুর্নীতিবাজ, তার প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ওয়াচডগের ভূমিকা পালন করা অসম্ভব। আবার মালিক ভালো হলেও যদি তার প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ ব্যক্তিরা অসৎ, চাটুকার এবং সুবিধাবাদী হয়ে থাকেন– তাহলে তাদের পক্ষেও গণতন্ত্রের অতন্দ্রপ্রহরীর দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচনটি যেমন অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক হতে হয়; তেমনি সেই পুরো প্রক্রিয়াটি নজরদারি করার জন্য গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকেও স্বাধীন ও শক্তিশালী হতে হয়।

লেখক: সাংবাদিক, চ্যানেল টোয়েন্টিফোর

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

গণমাধ্যম, নির্বাচন ও নারী

মামুন অর রশিদ

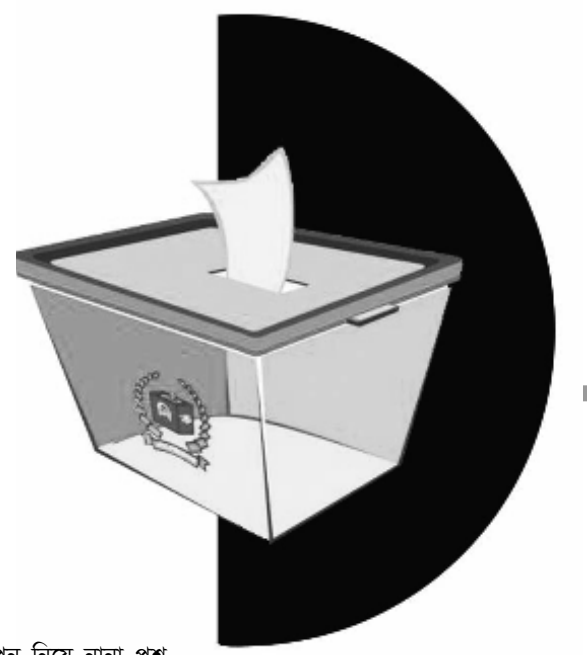

এমনিতেই গণমাধ্যমে নারীর উপস্থিতি ও উপস্থাপন নিয়ে নানা প্রশ্ন-অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয় নানা গবেষক গবেষণা করেও দেখিয়েছেন। গণমাধ্যমে প্রচারিত ও প্রকাশিত সংবাদের আধেয় বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মাত্র কয়েক শতাংশ সংবাদের মূল উপজীব্য হয় নারীর উপস্থিতি, অন্যদিকে বাকি সিংহভাগই সংবাদের মূল বিষয় পুরুষ। প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশেই নির্বাচন ক্ষমতা রূপান্তরের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। নির্বাচনের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতার পালাবদল হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকেই জাতীয় নির্বাচন থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরে নির্বাচন হয়ে আসছে। এসব নির্বাচনে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করে আসছেন। এখন দেখার বিষয় হলো, নির্বাচনকালীন গণমাধ্যমের সংবাদের আধেয়তে পুরুষের পাশাপাশি নারীর উপস্থাপনে কোনো ধরনের ফারাক আছে কি না। নিউজ ট্রিটমেন্ট থেকে শুরু করে শব্দের ব্যবহারে কোনো ধরনের জেন্ডার পক্ষপাতমূলক সংবাদ পরিবেশন হচ্ছে কি না। গণমাধ্যমকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। অর্থাৎ এখানে সমাজের চিত্র আয়নার মতো ভেসে উঠে। নারীকে চিরায়ত নারীত্বের বেড়াজালে উপস্থাপন না করে নারীকে নারীর মতোই উপস্থাপন নিশ্চিত করা গণমাধ্যমের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভায় দুইজন নারী সংসদ সদস্য ছিলেন। ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে সরাসরি ভোটে পাঁচজন নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমান সংসদে ৬৯ জন নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন। এছাড়া মন্ত্রিসভায় নারী তো আছেনই– প্রধানমন্ত্রী নারী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী নারী, বিরোধীদলীয় নেতা নারী, এমনিক জাতীয় সংসদের স্পিকারও নারী। মূলত জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীরা ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পান। এ ধরনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নারীদের জন্য সংসদে ৫০টি আসন সংরক্ষণের বিধান রয়েছে, যা মূলত আলংকারিক। তবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের সত্যিকারের প্রতিফলন ঘটে সংসদের সাধারণ আসনে নারীর প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে, যে ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়লেও এখনো গর্ব করার পর্যায়ে পৌঁছায়নি, এ কথা অকপটেই বলা যায়। (মজুমদার, ২০১৮)।

সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য বা নেতিবাচক মনমানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে সংরক্ষিত আসনের প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে। নারীরা এগিয়ে যাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে তো বাস, অ্যারোপ্লেন বা গতিময় কোনো প্রতীক দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু 'নারী নারী' ভাব বজায় রাখার জন্য প্রতীক দেওয়া হয়েছে ভ্যানিটি ব্যাগ, শিল-পাটাসহ এ ধরনের জিনিস

আমরা দেখি, ২০০৮ সালের নির্বাচনে ১ হাজার ৫৬৬ প্রার্থীর মধ্যে ৫৭ জন নারী, যা মোট প্রার্থীর ৩ দশমিক ৬ শতাংশ। জয়লাভ করেন ১৯ জন। তবে ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী নারী প্রার্থীর সংখ্যা কমে যায়। নির্বাচনে ২৭টি আসনে নারী প্রার্থী ছিলেন ২৮ জন (৩০০ আসনে মোট প্রার্থী ৫৪৩ জন)। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক জনগোষ্ঠী হিসেবে মাত্র ৬ শতাংশ (৩০০ জনের মধ্যে ১৮ জন) আসনে নারীদের বিজয়ী হওয়া, রাজনীতিতে নারীর সম্মানজনক অবস্থানের প্রতিফলন কোনো মতেই হতে পারে না।

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও নারীর অংশগ্রহণ আশাব্যঞ্জক হয়ে উঠেনি। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে চার হাজার ইউপিতে মাত্র ২৯ জন নারী চেয়ারম্যান পদে বিজয়ী হয়েছেন। পক্ষান্তরে ২০১১ সালের ইউপি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন ২২৬ জন, জয়ী হন ২৩ জন। ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে নারীর অংশগ্রহণ খুবই কম ছিল। এসডিসির গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাঁচ বছরের ব্যবধানে উপজেলা নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণ ৪৮ শতাংশ কমেছে। (প্রথম আলো, ২৩ এপ্রিল ২০১৬)।

অন্যদিকে, ২০০৯ সালের উপজেলা নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারীর সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৯০০ আর ২০১৪ সালের ৪৫৮টি উপজেলা নির্বাচনে তা কমে দাঁড়ায় ১ হাজার ৫০৭ জনে। এই হিসাবে ২০০৯ সালে প্রতি উপজেলায় ৭ থেকে ৯ জন নারী প্রতিনিধিত্ব করেন। ২০১৪ সালে এই হার গড়ে দাঁড়ায় ৩ থেকে ৪ জনে। একইভাবে ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনে মাত্র ১ দশমিক ৬৩ শতাংশ নারী মেয়র পদে জয়লাভ করেন।

রাজনৈতিক দলে নারীর প্রতিনিধিত্ব

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন স্তরের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হলে নারীরা দলীয় সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পান। প্রসঙ্গত, নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলের সর্বস্তরে ২০২০ সালের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ নারীর প্রতিনিধিত্ব বাধ্যতামূলক করার বিধান ২০০৯ সালে সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এ যুক্ত করা হয়, যাতে রাজনীতিতে নারীর দৃশ্যমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়। আমরা মনে করি, প্রতীকী প্রতিনিধিত্বের পরিবর্তে এ ধরনের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব ভবিষ্যতে নারীর জন্য ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রবেশ করার সুযোগ সৃষ্টি করবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, লক্ষ্যপূরণের আর মাত্র তিন বছর বাকি থাকলেও বর্তমানে বেশির ভাগ রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় স্তরে বা কমিটিতে নারীর এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব নেই। (মজুমদার, ২০১৮)।

বর্তমানে ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য পদে চারজন এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) স্থায়ী কমিটিতে রয়েছেন একজন নারী। আওয়ামী লীগের ৪০ সদস্যের উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে দুজন নারী আছেন। ৭৩ জন সদস্য নিয়ে গঠিত বিএনপির উপদেষ্টা পরিষদে ছয়জন নারী রয়েছেন। আবার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আটজনের মধ্যে একজনও নারী নেই। অন্যদিকে বিএনপিতে একই পদে ১০ জনের বিপরীতে নারী আছেন দুজন। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক পদে চারজনের বিপরীতে নারী একজন। কিন্তু বিএনপিতে একই পদে কোনো নারী সদস্য নেই (মোট সদস্য আটজন)। ৭৮ সদস্য নিয়ে গঠিত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে নারী আছেন ১৫ জন, যেখানে বিএনপিতে আছেন ৬৫ জন (মোট সদস্য ৫০২ জন)।

২০২০ সাল পূর্ণ হতে আর এক বছর তিন মাস বাকি। এ অবস্থায় দলে এক-তৃতীয়াংশ নারীর প্রতিনিধিত্ব রাখার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান জানতে চেয়ে ইসির পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়। ৪০টি দলের মধ্যে ১০টি দল নারী নেতৃত্বের বিষয়ে বর্তমানে দলের কী অবস্থান, তা ইসিকে জানিয়েছে। দলগুলোর প্রদত্ত প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, ৪০টি নিবন্ধিত দলের মধ্যে একটিমাত্র দল (গণফ্রন্ট) তাদের নেতৃত্বে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধি আনতে পেরেছে। প্রতিবেদন থেকে আরও দেখা যায়, আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের ৮১ জনের মধ্যে ১৫ জন নারী; শতকরা হারে তা ১৮ শতাংশ। সংসদে দলের সরাসরি আসনে বিজয়ী ১৬ জন নারী রয়েছেন। বিএনপির সব স্তরের কমিটিতে ১৫ শতাংশ নারী সদস্য রয়েছেন। আর জাতীয় পার্টির সব পর্যায়ের কমিটিতে নারী রয়েছেন ২০ শতাংশ। (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৮ মার্চ ২০১৮)।

প্রসঙ্গত, সরকার পরিচালনায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়লেও এখনো তা আশাব্যঞ্জক নয়। দশম সংসদে সর্বমোট ৫১ জনের মধ্যে মাত্র ৫ জন (৯ দশমিক ৮ শতাংশ) নারী মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তবে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি হতে পারে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি, যা ভারতের পঞ্চায়েত প্রথায় বিরাজমান। এ পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব আসন থেকে পর্যায়ক্রমে একজন নারী সদস্য নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ পান।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আমাদের জাতীয় সংসদের এক-তৃতীয়াংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকে এবং এগুলো ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে পূরণের সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে প্রথম টার্মে লটারি কিংবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে ১০০ আসন চিহ্নিত করে এগুলো নারীদের জন্য সংরক্ষিত করা হবে। এসব নির্ধারিত ১০০ আসনে শুধু নারীরাই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। অন্য ২০০ আসন নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যই উন্মুক্ত থাকবে। পরবর্তী নির্বাচনে আগেরবারের ২০০ উন্মুক্ত আসনের মধ্য থেকে লটারি কিংবা অন্য কোনো পদ্ধতিতে ১০০ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত করা হবে। অন্য ২০০ আসনে (যার মধ্যে প্রথমবারের ১০০ সংরক্ষিত আসন অন্তর্ভুক্ত) নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। তৃতীয় টার্মে অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত হবে এবং অন্য ২০০ আসন উন্মুক্ত হয়ে যাবে। যত দিন পর্যন্ত নারী পুরুষের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচনে জিতে আসার মতো অবস্থানে না আসবে, তত দিন এই সংরক্ষণ-পদ্ধতি অব্যাহত থাকবে। (মজুমদার, ২০১৮)।

নির্বাচনি প্রতিবেদনে নারীর উপস্থাপন

নির্বাচনি প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, সাংবাদিকরা সজ্ঞানে বা অবচেতনে একজন নারী প্রার্থীকে গতানুগতিক নারীত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে উপস্থাপন করতে দেখা যায়। এখানে একজন দেখা গেছে যেসব নারী প্রার্থী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন, তাদের 'চিরায়ত নারীত্বের বেড়াজালে' আবদ্ধ হয়ে গণমাধ্যমে উপস্থাপিত করা হচ্ছে। এখানে গতানুগতিক নারী প্রার্থীর পোশাক থেকে শুরু করে বৈবাহিক অবস্থা, পারিবারিক ভূমিকা, সন্তানসন্ততি ইত্যাদি বিষয়কেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এখানে তাদের নির্বাচনি অঙ্গীকারনামা বা ইশতেহারের চেয়ে ব্যক্তি ইমেজকেই বেশি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

নিউজ ট্রিটমেন্ট

নির্বাচনের সময় সবসময় একটা অভিযোগ পাওয়া যায় যে, গণমাধ্যমগুলো নারী প্রার্থীদের চেয়ে পুরুষ প্রার্থীদের প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকে। বাংলাদেশের গণমাধ্যমের দিকে তাকালে দেখা যাবে, প্রায় অধিকাংশ মিডিয়া হাউসের শীর্ষ পদগুলোয় পুরুষের পদচারণা। সেটাও একটা বিষয় হতে পারে নিউজ ট্রিটমেন্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে অথবা পাঠক বা দর্শকের চাহিদার ওপর নির্ভর করেই এমন ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয়। তবে এটা সত্য যে, পাবলিক এজেন্ডা কী হবে, পাবলিক কী নিয়ে ভাববে, কী খাবে– সবকিছুই গণমাধ্যমই নির্ধারণ করে দেয়। সুতরাং নির্বাচনি প্রতিবেদন প্রচারে নারী-পুরুষে কোনো ধরনের বৈষম্য করা যাবে না। সবাইকে সমান ট্রিটমেন্ট দিতে হবে।

তবে পরিহাসের বিষয় হলো, শুধু আমাদের দেশেই এমন অবস্থা বিরাজ করছে এমন নয়। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশেও আরও ভয়াবহ অবস্থা। যেমন– মাল্টা, সাইপ্রাস, লাটভিয়া, লিথুনিয়া, পোলান্ড এবং হাঙ্গিরিতে ২০০৪, ২০০৯ এবং ২০১৪ সালের নির্বাচনে দেখা যায়, মিডিয়া কাভারেজ পাওয়ার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ প্রার্থীর ব্যাপক ব্যবধান রয়েছে। ২০০৪ সালের নির্বাচনি সংবাদে ৮০ শতাংশ পুরুষের অন্যদিকে নারীর অবস্থান মাত্র ২০ শতাংশ সংবাদে। আবার ২০০৯ ও ২০১৪ সালে নির্বাচনে নারীর অবস্থান কিছুটা উন্নতি হয়ে দাঁড়ায় মাত্র ২৫ শতাংশ, অন্যদিকে পুরুষের অবস্থান ৭৫ শতাংশ সংবাদে।

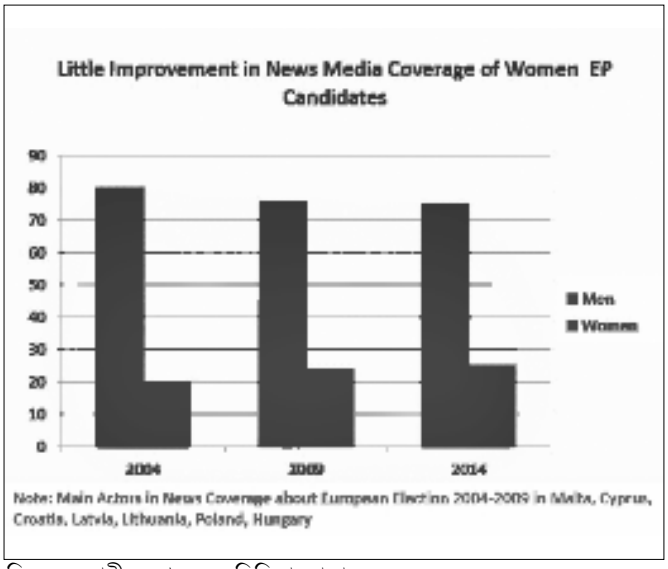

চিত্র-১ : নারী ও পুরুষের মিডিয়া কাভারেজ

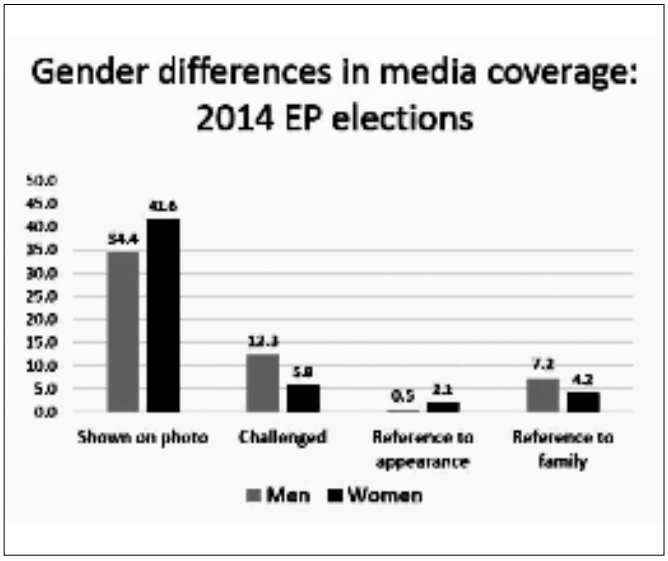

চিত্র-২ : মিডিয়া কাভারেজে জেন্ডার ভিন্নতা

প্রতীক বরাদ্দের চিরায়ত ধারণা

নির্বাচনে প্রতীক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রার্থীদের প্রতীক নিয়ে নির্বাচনি প্রতিবেদন তৈরির সময় খেয়াল রাখা দরকার নারী ও পুরুষ প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দে কোনো ধরনের চিরায়ত ধ্যানধারণা কাজ করেছে কি না। প্রতীক যাতে নেতিবাচক অর্থ বহন না করে, সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে। আমাদের দেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য ১৪০টি প্রতীক বরাদ্দ থাকলেও পরে তা কমিয়ে ৬৫টি রাখা হয়। এর মধ্যে ৪০টি প্রতীক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জন্য বরাদ্দ। ৭৫টি প্রতীক সিটি করপোরেশন, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন নির্বাচনের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়।

২০১৫ সালের ঢাকা সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দের দিকে তাকালে দেখা যায়, সেখানে প্রতীক বরাদ্দের সময় চিরায়ত ধ্যানধারণা কাজ করেছে। সিটি নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের প্রতীকের মধ্যে মুলা, শিল-পাটা বা ভ্যানিটি ব্যাগ নয়, সংরক্ষিত আসনের নারী কাউন্সিলরদের এবার কেটলি, গ্লাস, মোড়া, পিঞ্জর, টিসু বক্স, পানপাতা, স্টিলের আলমারি, বয়াম, প্রেশার কুকার, হারমোনিয়াম, দোলনা, ঝুমঝুমি ও টিয়ে পাখি। (প্রথম আলো, ২০১৫)।

চিত্র-৩ : প্রতীক বরাদ্দেও পুরুষতান্ত্রিকতা

অন্যদিকে পুরুষ প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দের দিকে তাকালে দেখা যায়, তাদের তালিকায় রয়েছে– টেবিল ঘড়ি, হাতি, ক্রিকেট ব্যাট, ইলিশ মাছ, লাউ, বাস, ময়ূর, চরকা, ঈগল, ফ্লাস্ক, ডিশঅ্যান্টেনা, টেবিল, টেলিস্কোপ, চিতাবাঘ, কমলালেবু, দেশলাই, রেডিও, এয়ারকন্ডিশনার, লাটিম, ট্রাক্টর, ঘুড়ি, ঝুড়ি, মিষ্টিকুমড়া, ঠেলাগাড়ি, টিফিন ক্যারিয়ার, করাত, ব্যাডমিন্টন ও র‍্যাকেট।

নারী অধিকার নিয়ে কাজ করেন– এমন অনেকেই বলেন, যুগ যুগ ধরে চলে আসা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতেই সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীদের এমন প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদের মতে, সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য বা নেতিবাচক মনমানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে সংরক্ষিত আসনের প্রতীক বরাদ্দের ক্ষেত্রে। নারীরা এগিয়ে যাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে তো বাস, অ্যারোপ্লেন বা গতিময় কোনো প্রতীক দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু 'নারী নারী' ভাব বজায় রাখার জন্য প্রতীক দেওয়া হয়েছে ভ্যানিটি ব্যাগ, শিল-পাটাসহ এ ধরনের জিনিস। এ ধরনের প্রতীক বরাদ্দের বিষয়টি খুবই অদ্ভুত। (প্রথম আলো, ২০১৫)।

সংবাদে জেন্ডার পক্ষপাতিত্ব শব্দের ব্যবহার

সংবাদের শব্দের ব্যবহারে পুরো অর্থ বদলে যায়। তাই সংবাদ পরিবেশনে পুরুষ এবং নারীবাচক শব্দগুলো খুব সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হয়। সারা বিশ্বে ১৯৭৫ সালের শুরুতে পুরুষ ও নারীর প্রারম্ভিক বৈশিষ্ট্যের ওপর গবেষণা শুরু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুজন গবেষক জন উইলিয়ামস ও সুসান বেনেট ৩০০ বিশ্ববিদ্যালয়পড়ুয়া শিক্ষার্থীর ওপর নির্বাচনি সংবাদগুলোয় নারী-পুরুষের উপস্থাপনায় কোনো শব্দগত পার্থক্য খুঁজে পান কি না, এ বিষয়ে একটি গবেষণা জরিপ পরিচালনা করেন। তাদের গবেষণায়, সংবাদগুলো উপস্থাপনে পুরুষ এবং নারীর নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লিঙ্গগত পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন। যেমন– নারী সংবেদনশীল, সৃজনশীল এবং সহায়ক হিসেবে দেখা হয়। অন্যদিকে পুরুষকে বিশ্বাসঘাতক, যৌক্তিক এবং বাস্তবসম্মত বলে মনে করা হয়। (উইলিয়ামস এবং বেনেট, ১৯৭৫)। ওই গবেষণায় শিক্ষার্থীরা যেসব শব্দ উল্লেখ করেছেন, তার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো।

পুরুষ প্রার্থীর সঙ্গে সংযুক্ত বৈশিষ্ট্য		নারী প্রার্থীর সঙ্গে সংযুক্ত বৈশিষ্ট্য	
নেতা হিসেবে	সহজেই প্রভাবিত না	আক্রান্ত	ঘরোয়া
কাজ করে	ছোটখাটো মধ্যে	অনুরক্ত	সদয়
সক্রিয়	উত্তেজনাপূর্ণ না	রসিক	বাচ্চাদের পছন্দ
দুঃসাহসী	সংকটে স্থির থাকে	আকর্ষণীয়	করে
আক্রমণাত্মক	ভয়ংকর না	অন্যদের অনুভূতি	বিনম্র
উচ্চাকাঙ্ক্ষী	বিনয়ী	সচেতন	হালকা
জিদপূর্ণ স্বৈরাচারী	স্পষ্টভাষী	কমনীয়	বিরক্তি
দাম্ভিক	মূলত	অভিযোগ	ঝরঝরে
প্রতিযোগিতামূলক	বাস্তবানুগ	সহানুভূতিশীল	অনুমোদন
সাহসী	শক্তসমর্থ	সৃজনী	প্রয়োজন

পুরুষ প্রার্থীর সঙ্গে সংযুক্ত বৈশিষ্ট্য		নারী প্রার্থীর সঙ্গে সংযুক্ত বৈশিষ্ট্য	
নিষ্ঠুর	আত্মবিশ্বাসী	সহজে cries	নিরাপত্তার জন্য
সাহসী	তীব্র	নির্ভরশীল	প্রয়োজন
অগোছাল	নিজেকে চলমান	অন্যদের আত্মীয়	অতিশালীন
সহজে ছাড় দেয় না	দেখায়	আবেগ লুকান না	ধার্মিক
প্রভাবশালী	প্রদর্শনী	স্বপ্নময়ী	সংবেদনশীল
উদ্যমী	ব্যবসায় দক্ষ	আবেগপ্রবণ	ভাবপ্রবণ
উচ্চতর মনে হয়	স্থিতিশীল	সংগীত এবং শিল্প	নরম মন
অগ্রবর্তী	চাপের অধীনে	উপভোগ করে	বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন
জবরদস্ত	দাঁড়িয়ে থাকে	উত্তেজনক্ষম	বিনয়ী
ক্রীড়ায় ভালো	অবিচলিত	নমনীয় অনুভূতি	শক্তিশালী সচেতন
সুদর্শন	কঠোর	প্রকাশ করে	কৌশলী
স্বাধীন	শক্তিশালী	নারী সংক্রান্ত	বাচাল
বুদ্ধিজীবী	একটি স্ট্যান্ড নেয়	চপল	বোধশক্তি
যৌন আগ্রহী	শক্ত	ছেনালিপূর্ণ	অন্যদের উষ্ণ
বলিষ্ঠ	হৃদয়াবেগবিহীন	অসার	করতে পারে
গণিত এবং বিজ্ঞান	উপায় জানে	ব্যস্তবাগীশ	দুর্বল
পছন্দ করে	সহজে সিদ্ধান্ত	মৃদু	অন্যদের সহায়ক
যৌক্তিক	তোলে	কৃতজ্ঞ	অতি ভাবপ্রবণ
	পুংলিঙ্গ		ক্রন্দনরত
	যান্ত্রিক দক্ষতা		
	আছে		

টেবিল: পুরষ ও নারীর প্রার্থীর সঙ্গে সংযুক্ত বৈশিষ্ট্য

নির্বচানি প্রতিবেদনে জেন্ডারের বিষয়টি প্রথম ঝড় তোলে ২০০৮ সালে মার্কিন নির্বাচনের সময় হিলারি ক্লিনটনের প্রার্থিতার প্রসঙ্গে। সেই সময়ে মার্কিন পত্রিকাগুলো প্রকাশিত কিছু প্রতিবেদনের অংশবিশেষকে জেন্ডারড বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। যেমন– হিলারি ক্লিনটনের শিক্ষানীতি ঘোষণা সংক্রান্ত প্রতিবেদেন ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার মূল ফোকাস ছিল তার গলায় ঝুলানো লকেটের প্রতি, যার বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল এভাবে, 'She was wearing a rose-colored blazer over a black top. The neckline sat low on her chest and a subtle V- Shape.'

নির্বাচনি প্রতিবেদনগুলো যদি জেন্ডারড হয়, তাহলে মূল সমস্যা দাঁড়ায়, প্রতিবেদকের দৃষ্টিভঙ্গিতে। আর এটি ভোটারদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। ফলে ভোটাররা পুরুষ প্রার্থীর তুলনায় নারী প্রার্থীকে কম যোগ্য মনে করেন। গবেষক লাওসেল দেখিয়েছেন (২০০৯), জেন্ডারড প্রতিবেদনের কারণে ভোটররা মনে করেন নারী প্রার্থীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সামাজিক ইস্যুতে ভালো কাজ করতে পারেন। আর পুরুষ প্রার্থী রাষ্ট্রের আর্থিক বিষয়াবলি, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি ভালো পরিচালনা করতে পারেন। তাই শুধু লৈঙ্গিক ভিন্নতার কারণে এ ধরেনর পক্ষপাতদুষ্ট প্রতিবেদন যেন না হয়, সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। (বুলবুল, ২০১৩)।

একটি যথার্থ প্রতিবেদন তৈরিতে যে বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে তা হলো:

* নারী-পুরুষ সব প্রার্থীকেই সমান নিউজ ট্রিটমেন্ট দিতে হবে।
* নারী প্রার্থীর পারিবারিক কিংবা বৈবাহিকের বিষয় না এনে তাদের যোগ্যতা বা ইশতেহারের দিকে নজর দিতে হবে।
* শব্দ ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। যে কোনোভাবেই যেন জেন্ডার পক্ষপাতিত্ব না হয়।
* নারী প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দে কোনো রকম বৈষম্য করা হয়েছে কি না, সেদিকেও নজর দিতে হবে।
* নারী প্রার্থীদের আলংকারিক বর্ণনা না দিয়ে তাদের যোগ্যতার বর্ণনা দিতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, গণমাধ্যমই সমাজের বৈষম্য ফুটিয়ে তোলে। আর সেই মাধ্যমেই যদি সমাজের একটি বৃহৎ অংশ এভাবে নিগৃহের শিকার হয়। সেটা খুবই পরিতাপের বিষয়। দেশকে এগিয়ে নিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীর ভূমিকাও কোনো অংশে কম নয়। নারীর ক্ষমতায়নের মূল লক্ষ্য হলো সব স্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চত করা। অতএব আশা করা যায়, নির্বাচনি প্রতিবেদন তৈরিতে নারী- পুরুষে কোনো বিভেদ না রেখে সুষ্ঠু ও সুন্দর পক্ষপাতমুক্ত সংবাদ পরিবেশন করবে গণমাধ্যমগুলো।

তথ্যসূত্র

১. বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৮ মার্চ ২০১৮। (https://bangla.bdnews24.com/media_bn/image/2014/03/18/—1)
২. বুলবুল, আফরোজা (২০১৩), নির্বাচনি প্রতিবেদনের কলাকৌশল, নিরীক্ষা, নভেম্বর-ডিসেম্বর-২০১৩, সংখ্যা-১৯৮, পৃ: ২১।
৩. দৈনিক প্রথম আলো, ২৭ এপ্রিল, ২০১৫। (https://www.prothoma-lo.com/we-are/article/513451)
৪. দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ এপ্রিল ২০১৬।
৫. মজুমদার, ড. বদিউল আলম (২০১৮), 'রাজনীতিতে নারীর অবস্থান কোথায়, ২৬ মার্চ ২০১৮। (http://www.bamajumdar.com /2018/03/blog-post_38.html)
৬. Lawless, J. (2004). Women, War, and Winning Elections: Gender Stereotyping in the Post-September 11th Era. *Political Research Quarterly , 57* (3), 479-490.
৭. Maarja Luhiste, Susan Banducci, Laura Sudulich (2017), *Biased news coverage affects women in politics."* International Women's Day 7 March, 2017, European Parliament.
৮. Williams, J., & Bennett, S. (1975). The definition of sex stereotypes via the adjective check list. *Sex Roles , 1*, 327-337.

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদন: শুরু থেকে শেষ

মিনহাজ উদ্দীন

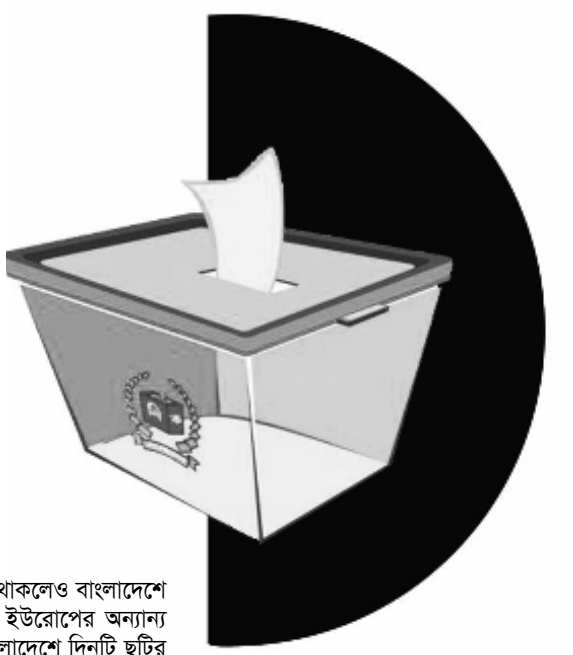

স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কিছুটা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আর শঙ্কা থাকলেও বাংলাদেশে নির্বাচন মানেই উৎসব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশে নির্বাচনের দিন সরকারি ছুটি থাকে না। তবে বাংলাদেশে দিনটি ছুটির দিন। নির্বাচন বিশেষ করে জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষ্যে অনেকেই শহর থেকে বাড়ি যান, অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের নিমন্ত্রণ জানানো হয়। এছাড়া নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্র এলাকাগুলোতে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে রকমারি দোকান বসে। বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে সার্বিকভাবে একটি উৎসব আবহ বিরাজ করে নির্বাচনকে ঘিরে।

তবে মনে রাখতে হবে নির্বাচন গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অত্যন্ত জরুরি বিষয়। কারণ নির্বাচনই জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের একমাত্র বৈধ পথ। যার মাধ্যমে গঠিত হয় সরকার। পরিচালিত হয় একটি দেশ বা স্থানীয় প্রশাসন। কিছু কিছু নির্বাচন আবার হয় বিশেষ অর্থে ফল নির্ধারণী। অর্থাৎ কিছু নির্বাচনে জনরায়ের মাধ্যমে স্বাধীন দেশের সৃষ্টি অথবা বৈধ সংগ্রামের ভিত্তি রচিত হয়। যেমন; নির্বাচনি ফল বা গণভোটের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া থেকে আলাদা হয়েছে পূর্ব তিমুর। আবার ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ঐতিহাসিক গণরায়ের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি এগিয়ে গেছে তার কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার লক্ষ্যে। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ওই নির্বাচনে (৭ ডিসেম্বর ১৯৭০, দুর্যোগকবলিত ৯টি জাতীয় পরিষদ ও ২১টি প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচন হয় ১৭ জানুয়ারি ১৯৭১) শেখ মুজিবুর রহমানের আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ১৬০টি আসন। নৌকা প্রতীকে ভোটের হার ৭৫.১১ শতাংশ। যার সাথে সাতটি সংরক্ষিত মহিলা আসন যুক্ত হয়ে মোট আসন সংখ্যা হয় ১৬৭টি। পূর্ব পাকিস্তানের অন্য দুটি আসনে জয় পেয়েছিল স্বতন্ত্র প্রার্থী চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় (পার্বত্য চট্টগ্রাম) আর পিডিপি'র নুরুল আমিন (তথ্য সূত্র: পৃ. ২৪২, আওয়ামী লীগ: উত্থানপর্ব ১৯৪৮-'৭০)। বাংলাদেশের জন্য ফল নির্ধারণী ওই নির্বাচনটি ছিল বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এই নির্বাচনে জয়লাভ করতে সব দলেরই প্রবল প্রচেষ্টা ছিল। এরকম প্রবল প্রচেষ্টা বা জিততেই হবে এমন মানসিকতা থেকেই অনেক সময় তৈরি হয় সংঘাত-সহিংসতা।

গণতন্ত্র আর গণমানুষের অধিকার প্রশ্নে নির্বাচন সংক্রান্ত সংবাদ প্রতিবেদন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নির্বাচন সংক্রান্ত বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন গণতন্ত্রকে সংহত করে। অনেক সময় এই নির্বাচনে অনিয়ম, কারচুপি, ঘটনা রাজনীতির গতিপ্রকৃতিও নির্ধারণ করে দেয়। যেমন; ১৯৯৪ সালের মাগুরা উপনির্বাচনের ঘটনাপ্রবাহ। বাংলাদেশের ইতিহাসে মাগুরার ওই নির্বাচন ভোট কারচুপি বা election engineering, ভোট চুরি বা vote rig-

নির্বাচনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নির্বাচনি ইশতেহার। ইশতেহারের ওপর ভিত্তি করে অনেক ভোটার ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে মনস্থির করে থাকেন। ইশতেহার এমন এক ধরনের দলিল বা অঙ্গীকারনামা যার ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক দল দেশ পরিচালনার দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে

ging-এর অনন্য একটি দৃষ্টান্ত। যে নির্বাচন নিয়ে গণমাধ্যমকর্মীরা সচিত্র, বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল। যাতে উঠে আসে ওই নির্বাচনে ভয়াবহ অনিয়ম আর নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ চেষ্টার খবর। যেসব সংবাদের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ পরিচালিত হয়েছে।

বর্তমান সময়ে নির্বাচনকেন্দ্রিক প্রতিবেদন তৈরি আরো কঠিন ও জটিল হয়েছে। নির্বাচনে এসেছে প্রযুক্তির ব্যবহার। সাথে নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণাতে এসেছে নতুনত্ব। এছাড়া সম্প্রচার মাধ্যমের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের আরও বেশি করে সতর্ক থাকতে হয়। বিশেষ করে ফলাফল ঘোষণার ক্ষেত্রে। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালের ৬ জুলাই গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই নির্বাচনে এম এ মান্নান ৩,৬৫,৪৪৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আজমত উল্লাহ খান। যিনি পান ২,৫৮,৮৬৭ ভোট। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ৬৩ শতাংশ হারে ওই নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৬,২৪,৩১১টি। অথচ এমন সমীকরণের বাইরে একটি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল বিজয়ী প্রার্থী এম এ মান্নানের প্রাপ্ত ভোট স্ক্রল নিউজে সম্প্রচার করেছিল প্রায় এক লক্ষ বেশি। তড়িঘড়িভাবে বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করতে গিয়েই চ্যানেলটি ওই গুরুতর ভুলটি করেছিল। যা ভীষণভাবে ওই চ্যানেলটির গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দেয়। যাই হোক, মূল কথা হলো দ্রুত তথ্য দিতে গিয়ে ভুল তথ্য দেওয়া কখনই কাম্য নয়। আর নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এই কাজ করার কোনো সুযোগ নেই।

বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদন শুধুই সাদামাটা রিপোর্ট নয়। এখানে অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন তৈরির বড়ো ধরনের সুযোগ রয়েছে।

নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদনের পর্যায়সমূহ

বিষয়বস্তু ও ঘটনাপ্রবাহের প্রেক্ষাপটে নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদনকে মূলত তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়:

ক. নির্বাচনপূর্ব প্রতিবেদন
খ. নির্বাচন দিনের প্রতিবেদন
গ. নির্বাচন-পরবর্তী প্রতিবেদন

ক. নির্বাচনপূর্ব প্রতিবেদন: মনে রাখা প্রয়োজন গণতান্ত্রিক কাঠামোর একটি রাষ্ট্রে নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ নিয়ে মানুষের আগ্রহও থাকে প্রবল। তবে নির্বাচন শুধুই নির্বাচন দিনের ঘটনাপ্রবাহ নয়। এর আগে-পেছনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। যেসব বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ, যথাযথ প্রতিবেদন তৈরি করা খুবই জরুরি। সাংবাদিকতায় প্রতিবেদন তৈরির ভিত্তি অনুযায়ী 'ষড়-ক' বা অনুসন্ধানী-ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন তৈরির কাঠামো অনুযায়ী প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। তবে প্রতিবেদন এই পরিসরে হয় অনেক বিস্তৃত। নিচে নির্বাচনপূর্ব সংবাদ প্রতিবেদনের পরিসর ও কিছু প্রতিবেদন প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করা হলো:

১. **নির্বাচনকালীন সরকার:** বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচনকালীন সরকার বা প্রশাসন একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্ষমতাসীন দল বা প্রভাববলয়ে থাকা প্রশাসন একটি দেশের নির্বাচনে ফল নির্ধারণী ভূমিকা রাখতে পারে। ১৯৯১ সালের নির্বাচন একটি একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর ১৯৯৬ সালে সংবিধান সংশোধন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা হয়। যদিও পরবর্তী সময়ে কয়েকটি নির্বাচনে এই সরকার ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছে। ২০০৬ সালে রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দীন আহম্মেদ নিজে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের পদ গ্রহণ করলে এ বিষয়ে ব্যাপক জটিলতা দেখা দেয়। এরপর এই ব্যবস্থাটি আরো জটিল ও বিতর্কিত হয়ে পড়ে। নির্বাচনকালীন সরকার বা প্রশাসন সংবাদের অন্যতম বড়ো উপাদান। এই বিষয়গুলো নিয়ে সংবাদকর্মীরা নানা বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে থাকেন।

২. **ভোটার তালিকা বা ভোটার নিবন্ধন:** ভোটার তালিকা বা নতুন ভোটার নিবন্ধন প্রক্রিয়া নির্বাচন সংক্রান্ত সাংবাদিকতার অন্যতম ক্ষেত্র। এ বিষয়ে অনুসন্ধান বা ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনও তৈরি করা যায়। যার ফল বা প্রভাব হতে পারে সুদূরপ্রসারী। যেমন, ২০০৬ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের অধীনে একটি ভোটার তালিকা হয়েছিল। যা ছিল ভীষণভাবে বিতর্কিত। যে ভোটার তালিকায় দেড় কোটি ভুয়া ভোটার নিবন্ধিত হয়েছিল। ২০০৭ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছবি সংবলিত জাতীয় পরিচয়পত্রের মাধ্যমে যে ভোটার তালিকা তৈরি করে তাতে ২০০৬ সালে তৈরি করা ভোটার তালিকায় ব্যাপক অনিয়ম আর জালিয়াতির বিষয়টি ধরা পড়ে। এছাড়া নতুন ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম নিয়েও প্রতিবেদন তৈরি হয়। যার মাধ্যমে পাঠক সচেতন থেকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে নির্বাচনে ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হন।

৩. **তফসিল:** তফসিল হলো নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক সময়সূচি। কবে ভোট, কবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া শুরু বা শেষ, প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষদিন কবে, কতদিন প্রচার-প্রচারণা চলবে এসব কিছুই থাকে তফসিলে। যথাযথ প্রস্তুতি নিয়ে নির্বাচন কমিশন মূলত গণমাধ্যমের সামনে তফসিল ঘোষণা করে থাকে। তফসিলের মাধ্যমেই নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। কোনো নির্বাচনি আসন বা এলাকার লোকজন তফসিলের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। এই তফসিলকে সামনে রেখেই অনেক হিসাব-নিকাশ নির্ধারিত হয়। গণমাধ্যমকর্মীরা তফসিলের খবর অতি গুরুত্বের সাথে প্রকাশ বা প্রচার করে থাকেন। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো ব্রেকিং নিউজ আকারে তফসিলের খবর সম্প্রচার করে থাকে। এই তফসিল নিয়ে অনেক সময় রাজনৈতিক দলগুলোর নানা ধরনের পর্যবেক্ষণ থাকে। তাদের মতামত বা কাঙ্ক্ষিত দিনক্ষণ এতে প্রতিফলিত হলো কি না তা গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়।

৪. **প্রচার-প্রচারণায় অনিয়ম ও অভিনবত্ব:** বিধি অনুযায়ী নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় তফসিল ঘোষণার পর। কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচনি সংস্কৃতি অনুযায়ী অনেক আগেই কৌশলী প্রচার-প্রচারণা শুরু হয়। বিভক্ত ঢাকা সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচনের প্রাক্কালে এরকম প্রচারণা ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। আইনজীবী তুহিন মালিক অনেকটা দৃষ্টিকটুভাবে পুরো ঢাকা শহর বিলবোর্ডে ভরিয়ে ফেলেছিলেন। ঠিক একইভাবে অন্য সম্ভাব্য প্রার্থীরাও মাঠে নেমে পড়েন। রঙিন পোস্টারে ভরে যায় ঢাকার দেওয়াল। যে বিষয়গুলো নিয়ে সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। এই বিষয়টি নিয়ে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনও প্রকাশ করেছে সংবাদমাধ্যমগুলো।

আর তফসিল ঘোষণার পর শুরু হয় ব্যাপক অর্থে প্রচার-প্রচারণা বা শোডাউন। যাতে যেমন খুঁজে পাওয়া যায় নানা অভিনবত্ব আবার নির্বাচনি আইন ভঙ্গ করেও অনেকে প্রচার-প্রচারণায় নেমে পড়েন, যা সংবাদে চলে আসে।

৫. **ভোটারদের প্রভাবিতকরণ বা ভোট কেনাবেচা:** খুব স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচনে সবাই জিততে চায়। আর এই চাওয়া থেকেই ভোট বেচাকেনার একটা সংস্কৃতি চালু হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে এর প্রবণতা অনেক বেশি। ভোটের আগে বিশেষ করে আগের রাতে ভোটারদের প্রভাবিত করতে এই কার্যক্রম বেশি পরিচালিত হয়। যার মাধ্যমে প্রার্থী তার জয় নিশ্চিত করতে চায়। একজন প্রতিবেদক এই নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরির সময় এই বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন। কারণ এই চর্চার মধ্যেই কালো টাকার ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয়। আর এক্ষেত্রে নির্বাচনি আইনও অনেক কড়া। তাই একজন প্রতিবেদক বিষয়টি ভেবেই প্রতিবেদন তৈরি করে থাকেন।

৬. **ভয়ভীতি প্রদর্শন, সন্ত্রাস-সহিংসতা:** নির্বাচনের ভীতি প্রদর্শন অতি পুরনো এক নেতিবাচক চর্চা। পেশিশক্তির ব্যবহার করে অনেকেই এই চর্চা করে থাকেন। যাতে বিপন্ন হয় সাধারণ ভোটারদের স্বাধীনতা। অনেক সময় সহিংসতার ঘটনাও ঘটে। এ বিষয়ে একজন প্রতিবেদক তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন। অনেকেই আবার প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে সহিংসতায় জড়িয়ে পড়েন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাঙচুর, লুটপাট বা অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে। এই বিষয়গুলোতে বস্তুনিষ্ঠ ও যথাযথ প্রতিবেদন তৈরি করা খুবই জরুরি। তা না হলে পুরো নির্বাচনি পরিবেশ বিঘ্নিত হতে পারে। অন্যদিকে যথাযথ প্রতিবেদন তৈরি করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সতর্ক হয়ে এই বিষয়গুলোতে আরও সতর্ক হতে পারে।

৭. **ভোটকেন্দ্র ও অন্যান্য আয়োজন:** ভোট একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। এর নানাদিক আছে। ভোটের সাথে যুক্ত সরকারের নানা অঙ্গ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান। ভোটকেন্দ্র ভোটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। সাধারণত জনসংখ্যার অনুপাতে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। আবার নারী ভোটারদের কথাও ভাবতে হয়। অন্যদিকে দুর্গম ও দুর্যোগকবলিত এলাকায় হলে বিষয়টি আবার অন্যভাবে আলোচিত হয়। তাই ভোটের আগে ভোটকেন্দ্র ও এই কেন্দ্রিক আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় নিয়ে সংবাদ হয়।

৮. **নির্বাচনি খরচ:** নির্বাচনি খরচ নিয়ে কমিশনের সুনির্দিষ্ট বিধি রয়েছে। কেউ যদি সেই বিধি লঙ্ঘন করে তাহলে সেটি বেআইনি। এই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশন ওই প্রার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে। ২০০৮ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ অনুযায়ী একজন সংসদ সদস্য প্রার্থীর সর্বোচ্চ নির্বাচনি ব্যয়সীমা ছিল ১৫ লক্ষ টাকা। এই ব্যয় নির্ধারণ করা হয় ভোটার

প্রতি হিসাব ধরে। এতে মাথাপিছু পাঁচ টাকা খরচের বিধান থাকে। যদি সবারই জানা, বাংলাদেশে একেক প্রার্থী আরও বেশি পরিমাণ অর্থ খরচ করে থাকেন। যা অবাধ, সুষ্ঠু ও প্রভাবমুক্ত নির্বাচনের অন্তরায়।

৯. **জোট ও রাজনৈতিক দলসমূহ:** রাজনৈতিক দল ও জোট নির্বাচনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মাধ্যমে নির্বাচনি পরিবেশ প্রভাবিত হয়। জোটগত নির্বাচন করার ফলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ে। অনেক সময় মাঠের লড়াইও জমে ওঠে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকেই জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার ব্যানারে এক ধরনের জোটগত প্রক্রিয়া সামনে চলে আসে। ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে সাবেক রাষ্ট্রপতি ডা. একিউএম বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও খ্যাতিমান আইনজীবী ড. কামাল হোসেন এই ঐক্য প্রক্রিয়া বা জোট প্রক্রিয়াতে নেতৃত্ব দেন। যা নিয়ে ভেতর বাইরে টানাপোড়েনও ছিল। এছাড়া ভোটে কোন দল কত আসনে প্রার্থী দিচ্ছে। তাদের কার্যক্রম কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেগুলোও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ উপাদান।

১০. **ইশতেহার:** নির্বাচনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নির্বাচনি ইশতেহার। ইশতেহারের ওপর ভিত্তি করে অনেক ভোটার ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে মনস্থির করে থাকেন। ইশতেহার এমন এক ধরনের দলিল বা অঙ্গীকারনামা যার ভিত্তিতে একটি রাজনৈতিক দল দেশ পরিচালনার দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে। জনগণের কাছে পবিত্র অঙ্গীকার করে থাকে। আবার ইশতেহারে অনেক কিছু থাকে যা হতে পারে বিতর্কিত। সাংবিধানিক কাঠামোর সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যেমন, ২০০৮ সালের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ তাদের ইশতেহারের একাংশে উল্লেখ করে 'রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে ব্লাসফেমি আইন কার্যকর করা হবে'। যা বাংলাদেশের সাংবিধানিক কাঠামোর সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। ওই নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের অঙ্গীকার করেছিল, যা তরুণ প্রজন্মকে ভীষণভাবে আলোড়িত করে। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী ওই নির্বাচনে প্রায় ১ কোটি ৩০ লক্ষ নতুন ভোটার প্রথমবার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। পরবর্তী সময়ে অনেক গবেষক উল্লেখ করেছেন, এই ১ কোটি ৩০ লক্ষ ভোটারকে একটি যুগোপযোগী ইশতেহারের মাধ্যমে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল আওয়ামী লীগ।

নিশ্চিতভাবেই রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতেহার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার তুলনামূলক বিশ্লেষণ নিয়েও একজন প্রতিবেদক ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন। হতে পারে অনুসন্ধানও।

খ. **নির্বাচন দিনের প্রতিবেদন:** নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদনে নির্বাচন দিনের কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই দিনের জন্যই সবার প্রস্তুতি থাকে। এই দিনের কার্যক্রমের ওপরই নির্ভর করে প্রার্থীর জয়-পরাজয় আর নির্বাচনের মান। প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে নির্বাচন দিনে নিচের বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ নজর রাখবেন:

১. **অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড:** বাংলাদেশে নির্বাচনের দিন ছুটি। এছাড়া এদিন প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নানা তৎপরতা থাকে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয় বাধানিষেধও থাকে। নির্বাচন দিনে কোনো ধরনের বিঘ্ন ছাড়া দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একজন সংবাদকর্মী ও তাঁর সহযোগীকে (ফটোগ্রাফার-ভিডিওগ্রাফার, ড্রাইভার, টিভি টেকনিশিয়ান ইত্যাদি) নির্বাচন কমিশন থেকে বিশেষ কার্ড সরবরাহ করা হয়। নির্বাচনের দিন একজন প্রতিবেদক অবশ্যই এই কার্ডটি বহন করবেন। নিরাপত্তার স্বার্থে বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করবেন।

২. **ভোট শুরু ও শেষ:** একজন সংবাদ প্রতিবেদক তাঁর দায়িত্বের অংশ হিসেবে অনেক কিছুই পর্যবেক্ষণ করেন। ভালো প্রতিবেদক একজন ভালো পর্যবেক্ষক হন। তাই ভোট শুরু (সাধারণত সকাল ৮টা) থেকে শেষ পর্যন্ত (সাধারণত বিকেল ৪টা) পর্যন্ত পুরো ঘটনাপ্রবাহ একজন প্রতিবেদক পর্যবেক্ষণ করেন। কোথাও ভোট শুরু হতে দেরি হলে বা নিয়ম ভঙ্গ করে অসদুদ্দেশ্যে কোথাও অতিরিক্ত সময় ভোট প্রদান করা হলে সে বিষয়গুলো একজন প্রতিবেদক তাঁর প্রতিবেদনে যুক্ত করেন।

৩. **সার্বিক পর্যবেক্ষণ:** নির্বাচনের দিন একজন প্রতিবেদক খুবই তৎপর পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন। ভোটকেন্দ্র, পোলিং এজেন্ট, প্রিসাইডিং অফিসার, প্রার্থী ও প্রার্থীর কর্মীদের কার্যকলাপ সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করবেন একজন প্রতিবেদক। এক্ষেত্রে শিথিলতা বা কোনো কিছুকে চেপে যাওয়ার সুযোগ নেই। এই পর্যবেক্ষণের আওতায় ব্যালট বাক্স, ব্যালট পেপার, ভোটার তালিকা, অমোচনীয় কালি, রাবারের সিলমোহর, বর্গাকার সিলমোহর, স্ট্যাম্প প্যাড, গালা, পিতলের সিলমোহর, চটের থলি, প্যাকেট ইত্যাদি। আর ভোট যদি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএমে হয়, তাহলে এ বিষয়ে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ করতে হবে প্রতিবেদককে।

৪. **নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা:** নির্বাচনের দিন নির্বাচনি কর্তৃপক্ষ (নির্বাচন কমিশন) ও তাদের অধীনে থাকা প্রশাসন বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নানা পদক্ষেপ সূক্ষ্মভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন প্রতিবেদক। টেলিভিশন সাংবাদিক প্রয়োজনীয় ভিডিও ধারণ করবেন। রেকর্ড করবেন প্রয়োজনীয় সাক্ষাৎকার। সাথে নির্বাচন কমিশনের কাছে ভোট গ্রহণ চলার সময় অভিযোগ করে নির্বাচন নিয়ে কোনো প্রার্থী যদি কোনো অভিযোগ করেন, সেই বিষয়গুলো গণমাধ্যমে প্রচার বা প্রকাশ হতে পারে। সাথে তাদের অভিযোগগুলো বড়ো প্রতিবেদনের জন্য ভালো সূত্র হতে পারে।

৫. **অনিয়ম:** নির্বাচনের দিন বিভিন্ন স্তরে সুযোগসন্ধানীরা নানা রকম অনিয়ম করে থাকে। এই অনিয়ম ভোট গণনার সময় বেশি হয়। অনেক ক্ষেত্রে ভোট গণনার সময় ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ছিনতাই খুবই পরিচিত একটি বিষয়। এছাড়া ব্যালট পেপার ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ, ভালোভাবে গণনা ইত্যাদি বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে, যা থেকে যথাযথ প্রতিবেদন তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গ. **নির্বাচন পরবর্তী প্রতিবেদন:** নির্বাচন-পরবর্তী সংবাদ খুবই জরুরি। কারণ নির্বাচনে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হওয়ার পর অনেক ঘটনা ঘটে যা অনিবার্যভাবেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফল নিশ্চিত হওয়ার পরপরই অনেক সংঘাত-সহিংসতাও ঘটে।

১. **সংঘাত-সহিংসতা:** নির্বাচনের পর সংঘাত-সহিংসতা নতুন কিছু নয়। বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন বা স্থানীয় নির্বাচনের পরপরই অনেক সময় সংঘাত-সহিংসতা ঘটে, যা প্রাণহানির নজিরও আছে। ২০০১ সালে চার দলীয় জোট সরকার নির্বাচিত হওয়ার পর দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘাত-হামলা, ধর্ষণের মতো ঘটনা ঘটে। যেসব অপরাধের পেছনে ছিল নির্বাচনি জয়-পরাজয়ের সমীকরণ। অনেক ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিছু কিছু সংঘাত নিরসনে ব্যবস্থা নিলেও অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়। ফলে ঘটে যায় অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। এসব ঘটনার পেছনে কারা, কারা হামলাকারী সেসব বিষয়গুলো তুলে ধরা একজন প্রতিবেদকের দায়িত্ব। একই সাথে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো দুর্বলতা থাকলে সেই বিষয়গুলোও গুরুত্বপূর্ণ কন্টেন্ট হিসেবে পত্রপত্রিকায় বা টেলিভিশনে আসবে।

উপরে উল্লিখিত আলোচ্য বিষয়গুলো ছাড়াও নিচে লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে একজন প্রতিবেদক জ্ঞান রাখবেন। সেগুলো হলো:

১. নির্বাচন কমিশন গঠন প্রক্রিয়া।
২. নির্বাচনি আইন ও বিধিবিধান।
৩. নির্বাচনি সীমানা সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত।
৪. আচরণবিধি।
৫. গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য বিধিবিধান।
৬. দেশি-বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষক।

একসময় বাংলাদেশের গণমাধ্যমে নির্বাচন কমিশন নামে আলাদা কোনো বিট ছিল না। এখন প্রায় প্রত্যেকটি মুদ্রণ মাধ্যম বা সম্প্রচার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন নিয়ে আলাদা দায়িত্বপ্রাপ্ত একাধিক প্রতিবেদক আছেন। যারা বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

তথ্যসূত্র

১. সাংবাদিক সহায়িকা, তথ্যপঞ্জি নির্বাচনি রিপোর্টিং (২০০৮, তৃতীয় সংস্করণ), ঢাকা: সেড।
২. বাগচী, তপন, নির্বাচন সাংবাদিকতা (২০০১) ঢাকা: বিসিডিজেসি।
৩. কিবরিয়া, গোলাম। (১৯৯১)। মুহম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত *সাংবাদিকতা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।
৪. The Reporters Guide: Handbook on Election Reporting (Second Edition), Dhaka: Society Environment and Humane Development (SHED)
৫. https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article973383.bdnews (27.09.18)
৬. আহমদ.মহিউদ্দীন, আওয়ামী লীগ: উত্থানপর্ব ১৯৪৮-'৭০, ঢাকা: প্রথমা।

লেখক: প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে রাজনৈতিক এবং নির্বাচনি সহিংসতার প্রবণতা ও ধরন

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

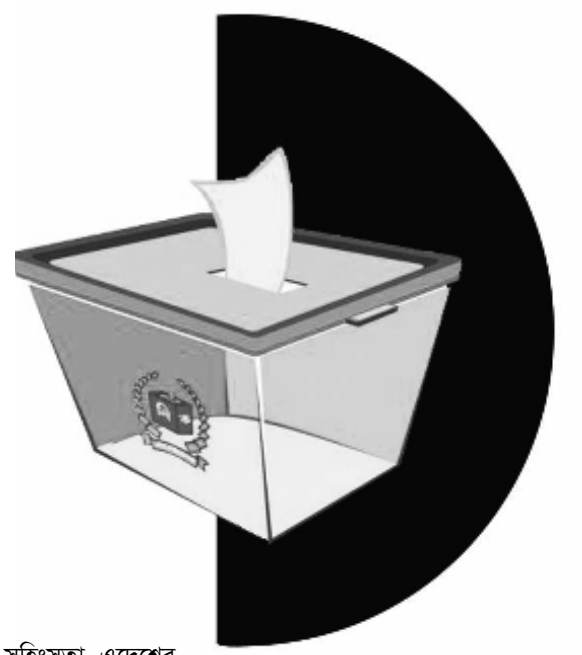

স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা এদেশের মানুষের মনে এক ধরনের উদ্বেগের বিষয়। ২০১৫ সালের ১৬ জানুয়ারি মানবাধিকার হাইকমিশনের কার্যালয়ের মুখপাত্র জেনেভা'তে একটি প্রেস ব্রিফিংয়ে বলেন, 'বাংলাদেশের ক্রমাগত গভীরতম রাজনৈতিক সহিংসতা খুবই বিপজ্জনক।' ২০১৫ সালের মার্চে দৈনিক টেলিগ্রাফের অনলাইন সংস্করণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সহিংসতার ভয়াবহতা তুলে ধরে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে তাতে বলা হয়: 'বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় যুদ্ধের মতো মানুষ মারা যায়, যা খুবই উদ্বেগজনক ঘটনা।' এই সহিংস রাজনৈতিক কার্যক্রম দিনে দিনে রাজনৈতিক চর্চার আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

২০১৮ সাল বাংলাদেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই বছরের শেষ নাগাদ এদেশের জাতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং রাজনৈতিক দলগুলো তাদের চূড়ান্ত আন্দোলন পরিচালনা করবে। ২০১৮ সালের সম্ভাব্য নিরাপত্তার হুমকি কী কী এবং কীভাবে নিরাপত্তা পরিস্থিতি প্রভাবিত হবে? এই প্রশ্নগুলোর সমাধান খুঁজতেই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

সহিংসতার সামগ্রিক প্রবণতা

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতাবিষয়ক তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সহিংসতার মাত্রা ও সংখ্যাগত প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী। সহিংসতা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। রাজনৈতিক কার্যক্রমের সাথে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে দিন দিন উন্নততর অস্ত্র সরবরাহ ও ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে প্রভাবিত করার প্রবণতা বেড়েছে। আমরা যদি গণমাধ্যমে রিপোর্ট হয়েছে এমন তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখতে পাব, ১৯৯১ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত মোট রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে ২,৫০০টি এবং ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত সময়ে তা বেড়েছে এবং ২০০৮ থেকে ২০১৩ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তা বেড়ে ২,৮০০তে উন্নীত হয়েছে। এই সময়ে উল্লিখিত সহিংসতায় ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় ১,৫০০, আহত হয়েছিল ৩৭,০০০ জনের মতো। এই সকল রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে পরবর্তী পাঁচ বছরে আরও ৫০০ জনের মৃত্যু এবং ৩,৪০০ জন আহত হয়। ২০০৬ - ২০১৩ সালে সহিংসতার তীব্রতা আরও বাড়ে এবং আঘাতের সংখ্যাও বিগত বছরগুলোর তুলনায় বেশি ছিল।

6

সাইবার সিকিউরিটি বাংলাদেশে অত্যন্ত দুর্বল। এদেশের সাইবার অবকাঠামোগুলো সবচেয়ে বেশি দুর্বল এবং তা নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো সক্ষমতা অর্জন করা এখনো দেশটির পক্ষে সম্ভব হয়নি। সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে সারা বিশ্বই বেশ চিন্তায় আছে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে

9

২০১৪ সালের জানুয়ারি ৫ অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো একটি নির্বাচন দেশের মানুষ, রাজনৈতিক দলসমূহ, গণতান্ত্রিক বিশ্বের বোদ্ধা কেউ-ই প্রত্যাশা করেনি। ওই নির্বাচনের পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে ওঠে। ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২৭ জানুয়ারি বন্দুকের গুলিতে ১৫ জন নিহত হয়, স্থানীয় সরকার নির্বাচন, পৌরসভা, সিটি করপোরেশন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও একই রকম ঘটনা ঘটেছে। ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, বোমা বিস্ফোরণের মতো ঘটনা সংঘটিত হয়। ২০১৫ সালের পৌরসভা নির্বাচনেও একই রকম ঘটনা ঘটেছে। এই নির্বাচনে মানুষকে এবং ভোটারদের ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে, যার সাথে সহিংসতাও প্রচারণার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। এই নির্বাচনে অনেক লোক হত হয়, পোলিং স্টেশন দখল করা হয় এবং বলা হয়, এই নির্বাচনে প্রতারণাপূর্ণ ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় এবং ২০১৬ সালের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও ১০ জন প্রাণ হারায় রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে।

২০১৭ সালের জুলাইয়ে হোলি আর্টিজানে ঘটে যাওয়া সন্ত্রাসী ঘটনা ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা এখনো সবার মনে রয়েছে। তারপরও তুলনামূলকভাবে ২০১৭ সালটিকে স্থিতিশীল সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে জঙ্গি দলগুলোর কর্মতৎপরতা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে। ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে এই জঙ্গি দলগুলো যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে না, তা এখনো বলা মুশকিল। কারণ দেশে নির্বাচনি সহিংসতা বাড়তে পারে, রোহিঙ্গা সংকট রয়েছে, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের কারণে অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতার জন্ম হতে পারে। তবে বিশুদ্ধ করে বলা মুশকিল যে, ২০১৮ সালে রাজনৈতিক কারণে বা জাতীয় নির্বাচনের সুযোগে প্রকৃতপক্ষে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তবে কোথায় কোন ধরনের বিরোধ হতে পারে এবং কোন বিরোধের জের ধরে সহিংসতা তৈরি এবং নাগরিকের নিরাপত্তার বিষয়গুলো বিঘ্নিত হতে পারে, তা বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়াস চালানো যেতে পারে।

১. রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিরোধ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, কলহের কারণে সহিংসতা বাড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। দেখা গেছে, ১৯৯০ সালে দেশে যত সহিংসতার মতো ঘটনা ঘটেছে, তার ২০% হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব, কোন্দল ও কলহে। ২০০৮ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সহিংসতার ৩৭% ঘটনা ঘটেছে দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিয়ে, যা নিজেদের মধ্যে পদ-পদবি ও সম্পদ ভাগাভাগি নিয়ে।

২. নির্বাচনি সহিংসতা যেন এদেশের রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। ২০১৮ সালের শেষ নাগাদ দেশ যে জাতীয় নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে, তাকে কেন্দ্র করে সহিংসতার আশঙ্কার দিকেও আমরা এগোচ্ছি। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশে রাজনীতি, নির্বাচনের প্রকৃতি দ্বান্দ্বিক এবং সহিংস, হরতাল, রাজপথে সংঘর্ষ, রাজপথে সহিংসতা আমাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমে বিদ্যমান। এই প্রবণতার আলোকে আমরা দেখতে পারি, ২০১৮ সালে উচ্চ সহিংসতার আকাঙ্ক্ষা যেমন আছে তেমনি একটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী শান্তিপূর্ণ চিত্রও দেখা যেতে পারে। বড়ো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতার মাত্রাই সেটি নির্ধারণ করবে বলে মনে হচ্ছে। নির্বাচন যত কাছে আসবে, দলগুলোর মধ্যে হিংসাত্মক সংঘর্ষগুলো তীব্রতর হবে। নির্বাচনকালীন সরকারের ধরন-রূপ কী হবে, কোন প্রকৃতির সরকারের অধীনে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করবে, নির্বাচন পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো এই সমঝোতায় পৌঁছতে ব্যর্থ হলেই অস্থিরতা ও সহিংসতার দিকে দেশ ধাবিত হবে। তাতে রাজনৈতিক দলগুলোর গ্রহণযোগ্যতা হারাবে, দেশ পরিচিত হবে ভঙ্গুর গণতন্ত্রে আর সমালোচনায় পড়বে গোটা জাতি।

৩. জঙ্গিবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ কোনো গণতান্ত্রিক দেশে অবস্থান করতে পারে না। হোলি আর্টিজানের ঘটনায় জঙ্গিরা মদত পায়, শক্তি দেখানোর মাধ্যমে অস্তিত্বের জানান দেয়। যদিও বাংলাদেশে জঙ্গি সংগঠনের কার্যক্রম এখন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করা যায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহ অনেক অপারেশন পরিচালনা করেছে; কিন্তু জঙ্গি সংগঠনের অনেক সদস্য এখনো সক্রিয় বা জীবিত বা আইনের আওতায় তাদের আনা সম্ভব হয়ে উঠেনি। এরাই আসন্ন নির্বাচনে সুযোগ গ্রহণ করতে পারে, সক্রিয় হয়ে সহিংস ঘটনাসমূহ ঘটাতে পারে, অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে যে কোনো শান্তিপূর্ণ জনপদ। এমনকি নির্বাচনপরবর্তী সময়েও তারা চাঙা হয়ে উঠতে পারে এবং জঙ্গি কার্যক্রমের উত্থান ঘটাতে পারে।

৪. রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের জন্য বর্তমানে সবচেয়ে বড়ো উদ্বিগ্নের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৮ সালে রোহিঙ্গা সংকট দেশের নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ। এমনিতেই এত বড়ো জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বাসস্থান, নিরাপত্তাবিধান করার ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অনেকেই আন্তর্জাতিক চোরাচালান সংঘর্ষের শিকার হতে পারেন, তাদেরকে ছোট অস্ত্রের বাহক হিসেবে ব্যবহার করতে পারে, তাদেরকে স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠীতে নিয়োগ করা হতে পারে, যার সবই তাদের জন্য মৌলিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করার শামিল। একই সাথে বাংলাদেশের জন্য নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

৫. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি ও দুর্যোগের দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। ২০১৮ সালের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সবার দৃষ্টি থাকবে জাতীয় নির্বাচনের দিকে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বাড়বে বৈ কমবে না– এ কথা বলা যেতে পারে। বন্যা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভারি ঘূর্ণিঝড়, তীব্র লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ, অব্যাহত তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ভূমিকম্পের ঝুঁকি রয়েছে। প্রাকৃতিক এই দুর্যোগ মোকাবিলা করার মতো দক্ষতা ও সামর্থ্য বা প্রস্তুতি বাংলাদেশের কোনোটিই নেই। একটি ভূমিকম্প এদেশের জন্য ইতিহাসের খারাপতম বিপর্যয় তৈরি করতে পারে।

৬. সাইবার সিকিউরিটি বাংলাদেশে অত্যন্ত দুর্বল। এদেশের সাইবার অবকাঠামোগুলো সবচেয়ে বেশি দুর্বল এবং তা নিয়ন্ত্রণে রাখার মতো সক্ষমতা অর্জন করা এখনো দেশটির পক্ষে সম্ভব হয়নি। সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে সারা বিশ্বই বেশ চিন্তায় আছে এবং তা নিয়ন্ত্রণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। নির্বাচনের সময় হ্যাকাররা তৎপর হয়ে ওঠে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ পাচারের মাধ্যমে এই শঙ্কা আরও তীব্রতর করে তুলেছে। এই বছর নির্বাচনের বছর, হ্যাকার তথ্য ম্যানিপুলেশন, তথ্য জালসহ নানা-ভাবে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করবে।

৭. আমাদের আর্থিক খাত ও ব্যাংকিং সেক্টরের এবং স্টক মার্কেটের অব্যাহত সংকট আমরা দেখেছি। দরপতনের, আধা-পতনের কাহিনি এবং পাবলিক ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে বিপুল অর্থ খোয়া যাওয়া, তহবিল হ্রাস পাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। ২০১৮ সালের নির্বাচনের সুযোগে এর মাত্রা বাড়াতে দেশকে আর্থিক নিরাপত্তার ঝুঁকিতে ফেলতে পারে।

৮. একটি দেশের গণতন্ত্র স্থিতিশীল থাকলে প্রতিবেশী দেশ এবং সেই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর মধ্যে তার ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের অস্থিতিশীল পরিবেশ পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর ওপর পড়তে পারে। আবার পার্শ্ববর্তী দেশের কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী বাংলাদেশের অস্থিতিশীলতার সুযোগে আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, নির্বাচনি সহিংসতা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো জন্য সবসময়ই হুমকি। নির্বাচন কমিশন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নির্বাচনের সময় শান্তিপূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে জনগণকে আশ্বাস দিতে পারে। তবে অতীতের নির্বাচনগুলোর আলোকে বলা যায়, সেই আশ্বাস দেওয়া বা সঠিক পরিবেশ তৈরি করা তাদের জন্য কঠিন একটি পরীক্ষা। বাংলাদেশের জনগণ, পরিণত রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যকর ভূমিকা সব মিলিয়ে ২০১৮ সালের ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে এদেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করা এবং গণতন্ত্র চর্চায় উত্তীর্ণ হতে পারব বলে আমরা বিশ্বাস করি।

লেখক: উন্নয়ন ও গণমাধ্যমবিষয়ক গবেষণা কর্মী

নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের নীতি ও নৈতিকতা

শুভ কর্মকার

বিশ্বনন্দিত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা গণতন্ত্র। রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। দর্শনটির মূলকথা– স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্ব। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেন, গণতন্ত্র হলো জনগণের সরকার, জনগণের দ্বারা গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার। গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ভোটের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা। নির্বাচিত প্রতিনিধি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ ক্ষমতায় যাওয়ার অন্যতম মাধ্যম হলো নির্বাচন। নির্বাচনে জেতার জন্য জনপ্রতিনিধিরা ব্যস্ত থাকে প্রচার-প্রচারণায়। সত্য-মিথ্যা, প্রচার-অপপ্রচার করে নির্বাচনে জয়লাভ করতে ব্যস্ত থাকেন প্রতিনিধিরা। সেক্ষেত্রে কোন তথ্য প্রকাশ করা হবে আর কোন তথ্য প্রকাশ করা হবে না, এ বিষয়ে দ্বিধায় থাকেন সাংবাদিক। তথ্য প্রকাশের দ্বিধা থেকে নৈতিকতা শক্তিশালী অবস্থান নেয় সাংবাদিক তথা জনগণের মানসপটে। জনগণও সত্য, ন্যায়-নীতিসম্পন্ন তথ্য প্রত্যাশা করে। এরকম পরিস্থিতিতে নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের নীতি ও নৈতিকতা জানা একজন সাংবাদিকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের নীতি ও নৈতিকতা

নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নীতি ও নৈতিকতায় দাঁড়িয়ে থেকেও অনেক সময়ই সত্য প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তবে মনে রাখতে হবে, সঠিক তথ্য প্রকাশ করা নির্বাচনবিষয়ক প্রতিবেদকের বৈধ দায়িত্ব। তাহলে এটা কি তার নৈতিক দায়িত্ব নয়? অবশ্যই নৈতিক দায়িত্ব। রাজনৈতিক প্রতিবেদন করার ক্ষেত্রে নৈতিক বিষয়টা মাথায় রাখা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষ করে নির্বাচনের সময়। রাজনৈতিক দলগুলো তার বিরোধীদের সম্পর্কে অনবরত নেতিবাচক কথা বলে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে বিরোধীদের অতীতের ব্যক্তিগত গল্পগুলো সামনে তুলে নিয়ে আসে। অনেক ক্ষেত্রে তারা ভোটের জন্য ভুয়া ও মিথ্যা গল্প প্রকাশ করতে থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদকের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া বেশির ভাগ সময়ই কঠিন হয়ে পড়ে। সম্পাদক এবং প্রতিবেদক উভয়ই একই ধরনের নৈতিক সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। গণপ্রতিনিধি এবং রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে শুধু সেসব ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করা যাবে, যদি সে ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডগুলো জনদায়িত্বের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

6

নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে নৈতিকতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নীতি ও নৈতিকতায় দাঁড়িয়ে থেকেও অনেক সময়ই সত্য প্রকাশ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তবে মনে রাখতে হবে, সঠিক তথ্য প্রকাশ করা নির্বাচনবিষয়ক প্রতিবেদকের বৈধ দায়িত্ব

9

সুতরাং নির্বাচনবিষয়ক প্রতিবেদককে তার নৈতিক মানদণ্ডের ওপর সচেতন থাকতে হবে। আপনি কি জানেন, নির্বাচনে প্রার্থীদের দেওয়া যেসব বক্তব্য আপনি প্রকাশ করতে চাইছেন, সেটা মিথ্যা অথবা বানানো খবর কি না? আশা করি জানেন না। তাহলে বক্তব্য প্রকাশের নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব নির্বাচনবিষয়ক প্রতিবেদকের ওপরই ন্যস্ত হচ্ছে। তিনিই সিদ্ধান্ত নেবেন, তিনি কী প্রকাশ করবেন আর কী করবেন না। নির্বাচনবিষয়ক প্রতিবেদনের নৈতিকতা নিয়ে অনেক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি নানা ধরনের মানদণ্ড তুলে ধরেছেন। সেই মানদণ্ডগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মানদণ্ড তুলে ধরা হলো।

গাইডলাইনস ফর প্রফেশনাল ইলেকশন রিপোর্টিং গ্রন্থে Henrik Keith and Abukar Albadri নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নৈতিকতার বিষয়ে বলেছেন (Keith and Albadri, 2016):

- নির্বাচনি প্রার্থীদের কাছ থেকে অর্থ কিংবা উপহার গ্রহণ করা উচিত না।
- প্রতিবেদক এবং সম্পাদকের রাজনৈতিক দলের সদস্য হওয়ার এবং ভোট দেওয়ার অধিকার থাকা সত্ত্বেও তাদের রাজনৈতিক সক্রিয় কর্মী হওয়া যাবে না। তারা শুধু নির্বাচনবিষয়ক প্রতিবেদন কাভার করবেন।
- সর্বদা সত্য অনুসন্ধান করবেন। হৃদয়ের গভীর থেকে সত্য খুঁজে বের করবেন এবং সত্য ঘটনাগুলো প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করবেন।
- মনে রাখতে হবে নির্বাচন রাজনীতিকে ঘিরে। রাজনীতির ইংরেজি শব্দ Politics এসেছে গ্রিক শব্দ Politicos থেকে, যার অর্থ for the citizens অর্থাৎ নাগরিকের জন্য। আপনার নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিং সর্বদা হবে নাগরিকের আগ্রহ থেকে।

২০১৩ সালে বালি মিডিয়া ফোরাম অনুষ্ঠিত হয়। ২৪টি দেশের ৭০ জন সম্পাদক নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের নৈতিকতা বিষয়ে বেশকিছু মতামত তুলে ধরেন। মতামতগুলো হলো:

- নির্বাচনের সময় সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার নিশ্চয়তা দাবি করতে হবে।
- গণমাধ্যম প্রভাবিত হয়, এমন কর্মকাণ্ড পরিচালনা হতে দেওয়া যাবে না। বিশেষ করে সংবাদ পরিবেশনের জন্য টাকা গ্রহণ কিংবা পেশি বা ক্ষমতার দ্বারা সংবাদ কাভারেজ বিকৃত করা।
- প্রতিবেদন সংবাদপত্রের মান প্রতিষ্ঠা করতে ঘৃণ্য বা সহিংসতা উদ্দীপক সব ধরনের রাজনৈতিক বক্তব্য মোকাবিলা এবং পরিহার করবে।

এসিই ইলেক্টোরাল নলেজ নেটওয়ার্ক নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে কিছু নীতি ও নৈতিকতার কথা তুলে ধরেছে। নীতিগুলো হলো:

- নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের তথ্য অন্যান্য প্রতিবেদনের মতো নির্ভুলভাবে তুলে ধরতে হবে।
- নিরপেক্ষতা নির্বাচনবিষয়ক রিপোর্টিংয়ের অন্যতম প্রধান নৈতিকতা। নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্রে প্রচার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যে কারণে তথ্য প্রকাশের আগে নিরপেক্ষতার বিষয়টি অবশ্যই প্রতিবেদককে খেয়াল রাখতে হবে।
- প্রতিবেদককে সততার সাথে কাজ করতে হবে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষমতা অবশ্যই থাকতে হবে। তবে প্রতিবেদক নৈতিকভাবে অটল থাকবেন।
- যে ধরনের ভাষা অথবা বাক্য বৈষম্য অথবা সহিংসতা তৈরি করতে পারে, সেগুলো পরিহার করতে হবে।
- ভুল বা মিথ্যা তথ্য সংবলিত প্রতিবেদন ছাপা হলে সংশোধনী দিতে হবে।
- প্রতিবেদকের প্রধান দায়িত্ব হলো সঠিক এবং পক্ষপাতহীন সংবাদ প্রকাশ করা।
- প্রতিবেদক প্রকৃত যা দেখেছেন বা তিনি যতটুকু জানেন ততটুকুই প্রকাশ করবেন। তিনি যা দেখেননি সেটা প্রকাশ করবেন না। আবার প্রকাশযোগ্য কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য অপ্রকাশিত রাখবেন না।
- সংবাদ উৎসের ক্ষেত্রে পেশাগত গোপনীয়তা বজায় রাখবেন।
- নির্বাচনবিষয়ক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতিবেদককে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করতে হবে। যদি একজন প্রার্থী আরেকজনের বিরুদ্ধে কিছু বলে, তবে উভয় প্রার্থীরই বক্তব্য তুলে ধরতে হবে।
- অন্য ব্যক্তির বর্ণনার পরিবর্তে প্রার্থী এবং রাজনৈতিক দলের প্রত্যক্ষ বক্তব্য তুলে ধরতে হবে।
- বৈষম্য বা সহিংসতা প্রতিরোধে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অ্যাডভোকেসি করতে পারে, এমন ব্যক্তির বক্তব্য সংবাদে তুলে ধরতে হবে।
- রাজনীতিবিদ অথবা প্রার্থীর কাছ থেকে কোনোরূপ প্রণোদনা বা উপহার নেওয়া যাবে না।
- রাজনীতিবিদ বা প্রার্থীর ছবি অথবা সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশ করা হবে– এমন কোনো নিশ্চয়তা প্রতিবেদক দেবেন না।
- নির্বাচনবিষয়ক প্রতিবেদন করতে গিয়ে অনেক গণমাধ্যমই জনমত জরিপ করে থাকে এবং কোন দল বা প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা বেশি, সেটা প্রকাশ করে থাকে। এ ধরনের প্রতিবেদন করার সময় অবশ্যই প্রতিবেদককে কাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, কখন নেওয়া হয়েছে, কতজনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, সাক্ষাৎকার গ্রহণের ভুলগুলো কী, কী ধরনের প্রশ্ন করা হয়েছে ইত্যাদি সংবাদে তুলে ধরতে হবে।
- প্রতিবেদন লেখার সময় সাংবাদিক প্লাজিয়ারিজম, ভুল উপস্থাপন, মানহানিবিষয়ক তথ্য প্রকাশ থেকে বিরত থাকবেন।

তথ্যসূত্র

Keith, Henrik and Albadri, Abukar (2016). *Guidelines for Professional Election Reporting*. Somalia: International Media Support (IMS) & Fojo Media Institute

লেখক: প্রভাষক, পিআইবি

গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

জাতীয় পরিচয়পত্র বিষয়ক সেবা

নুরুন্নাহার নুরু

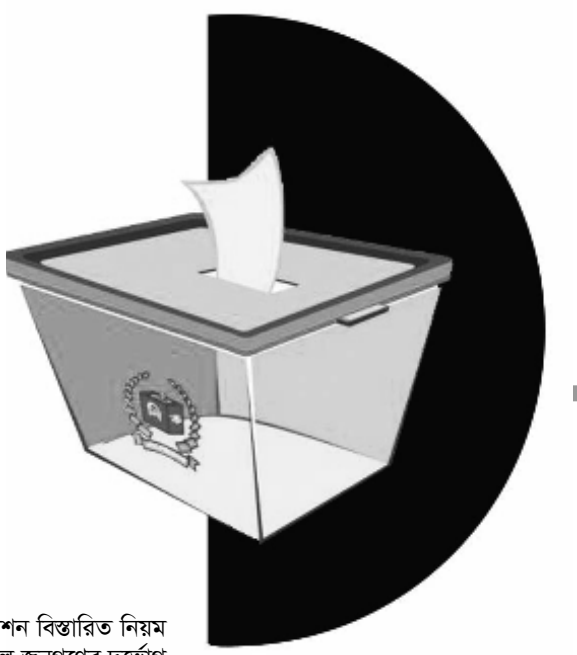

জাতীয় পরিচয়পত্রবিষয়ক সেবাপ্রাপ্তিতে নির্বাচন কমিশন বিস্তারিত নিয়ম প্রবর্তন করেছে। এক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম অনুসরণ করলে জনগণের দুর্ভোগ যেমন কমবে, তেমনি পরিচয়পত্র সংক্রান্ত জটিলতাও দূর হবে। নতুন পরিচয়পত্র তৈরি, নবায়ন ও ভুল সংশোধনে নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে। এ নিয়ম অনুসরণ করে যে কোনো নাগরিকই জাতীয় পরিচয়পত্রবিষয়ক সমস্যা মোকাবিলা করতে পারেন। এক্ষেত্রে নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্তির জন্য ১১টি শর্ত পূরণ করতে হবে। ভোটার এলাকা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ৮টি, হারানো জাতীয় পরিচয়পত্র ইস্যুর ক্ষেত্রে ২টি শর্ত পূরণ করতে হবে। পরিচয়পত্র সংশোধনের জন্য নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে।

সরকারি সব অনলাইন সুবিধা, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, সম্পত্তি কেনাবেচা, টিআইএন প্রাপ্তি, বিয়ে রেজিস্ট্রেশন, পাসপোর্ট, ব্যাংক হিসাব খোলা, ব্যাংকে ঋণগ্রহণ, সরকারি ভাতা উত্তোলন, সহায়তা প্রাপ্তি, বিআইএন, শেয়ার-বিও অ্যাকাউন্ট, ট্রেড লাইসেন্স, যানবাহন রেজিস্ট্রেশন, বিমা স্কিম, ই-গভর্নেন্স, গ্যাস-বিদ্যুৎ সংযোগ, মোবাইল সংযোগ, হেলথ কার্ড, ই-ক্যাশ, ব্যাংক লেনদেন ও শিক্ষার্থীদের ভর্তির কাজ ছাড়াও আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজে জাতীয় পরিচয়পত্রের প্রয়োজন হয়। দেশের ১০ কোটি ৪০ লাখ ভোটার এনআইডি পেয়েছে।

নিম্নে শর্তাবলি উল্লেখ করা হলো:

নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে

১. বাংলায় সঠিকভাবে পূরণকৃত ভোটার নিবন্ধন ফরম-২।
২. অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপি।
৩. এসএসসি/সমমান সনদের সত্যায়িত কপি।
৪. পাসপোর্টের সত্যায়িত কপি।
৫. পিতা-মাতা, স্বামী/স্ত্রীর জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত কপি।
৬. রক্তের গ্রুপ সংযোজনের জন্য ব্লাড টেস্ট রিপোর্ট।
৭. সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ের বিদ্যুৎ/গ্যাস/পানি/টেলিফোন (যে কোনো ০১টি) বিলের ফটোকপি (যে কোনো মাসের)।
৮. চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনারের প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদের কপি।
৯. আবেদন ফরমের ৩৪ ও ৩৫নং ঘরে শনাক্তকারী হিসেবে বাবা/মা/স্বামী/নিকট আত্মীয়ের জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও স্বাক্ষর সাথে নিয়ে আসতে হবে।

নতুন পরিচয়পত্র তৈরি, নবায়ন ও ভুল সংশোধনে নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত নিয়ম রয়েছে। এ নিয়ম অনুসরণ করে যে কোনো নাগরিকই জাতীয় পরিচয়পত্রবিষয়ক সমস্যা মোকাবিলা করতে পারেন। এক্ষেত্রে নতুন ভোটার অন্তর্ভুক্তির জন্য ১১টি শর্ত পূরণ করতে হবে। ভোটার এলাকা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ৮টি, হারানো জাতীয় পরিচয়পত্র ইস্যুর ক্ষেত্রে ২টি শর্ত পূরণ করতে হবে

১০. আবেদন ফরমের ৪০, ৪১ ও ৪২নং ঘরে ওয়ার্ড কাউন্সিলর/চেয়ারম্যানের নাম, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও স্বাক্ষর নিয়ে আসতে হবে।
১১. দ্বৈত নাগরিক হলে বাংলাদেশি Valid Passport (Arrival Date সহ প্রথম তিন পাতা)/স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত দ্বৈত নাগরিকত্ব সনদের কপি।

জাতীয় পরিচয়পত্র হারানো/সংশোধন বাবদ নির্ধারিত ফি
বি. দ্র. ১৫% ভ্যাটসহ ফি জমা দিতে হবে।

ক্র. নং	আবেদনের ধরন	১ম বার আবেদন	২য় বার আবেদন	পরবর্তী আবেদনের ক্ষেত্রে
১.	হারানো বাবদ ফি	২০০/-	৩০০/-	৫০০/-
২.	সংশোধন বাবদ ফি	২০০/-	৩০০/-	৪০০/-

ভোটার এলাকা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে
১. বাংলায় সঠিকভাবে পূরণকৃত স্থানান্তর আবেদন ফরম-১৩।
২. জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।
৩. সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার/চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদের ফটোকপি।
৪. সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ের বিদ্যুৎ/গ্যাস/পানি/টেলিফোন (যে কোনো ০১টি) বিলের ফটোকপি (যে কোনো মাসের)।
৫. বাড়ির মালিক হলে হোল্ডিং কর পরিশোধের রসিদের ফটোকপি।
৬. ভাড়া বাড়ি হলে ভাড়ার চুক্তিনামার ফটোকপি।
৭. ফরম-১৩তে শনাক্তকারীর স্বাক্ষর (যে এলাকায় স্থানান্তরিত হতে ইচ্ছুক সে এলাকার যে কোনো ভোটার শনাক্তকারী হিসেবে স্বাক্ষর করবে)।
৮. শনাক্তকারীর জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি।

বি. দ্র. * ফরম-১৩ এর ৪ ও ৫নং কলাম পূরণ করতে হবে না।
* স্থানান্তর ফরম-১৩ ব্যতীত সকল কাগজপত্র সত্যায়িত করে দাখিল করতে হবে।

হারানো জাতীয় পরিচয়পত্র ইস্যু
১. যে কোনো থানায় জাতীয় পরিচয়পত্র/ভোটার নম্বরসহ জিডির মূল কপি।
২. বাংলায় সঠিকভাবে পূরণকৃত হারানো আবেদন ফরম-০৬।

* আমার ভোট আমি দিব জেনেশুনে বুঝে দিব।
* স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র করে, পরিচয় দিব গর্বভরে।
* ভোট বিক্রিতো বিবেক বিক্রি।
* একাধিক বার ভোটার হওয়া দণ্ডনীয় অপরাধ।
* জাতীয় পরিচয়পত্র যে কোনো সংশোধনের জন্য আপনার সংশ্লিষ্ট থানা/উপজেলা নির্বাচন অফিসে যোগাযোগ করুন।

জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত যে কোনো সেবা পেতে আপনার সংশ্লিষ্ট থানা/উপজেলা নির্বাচন অফিসে যোগাযোগ করুন।
সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিস, ঢাকা
নির্বাচন প্রশিক্ষণ ভবন (৩য় তলা), প্লট-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা।

সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিস, ঢাকা ও এর আওতাধীন ২০টি থানা/উপজেলা নির্বাচন অফিসের ঠিকানা ও ফোন নম্বর

ক্র. নং	কর্মকর্তাদের পদবি	অফিসের ঠিকানা	টেলিফোন নম্বর (অফিস)	কর্পোরেট মোবাইল নম্বর
১.	সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার, ঢাকা	নির্বাচন প্রশিক্ষণ ভবন (৩য় তলা), প্লট ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা।	৮১৮১০১৯	০১৫৫০০৪২২০৯
	নির্বাচন অফিসার (১)		৮১৮১৪৮৩	০১৫৫০০৪২২১০
	নির্বাচন অফিসার (২)		৮১৮১৪৯৪	০১৫৫০০৪২২১১
২.	থানা নির্বাচন অফিসার, রমনা, ঢাকা	১ম ১২ তলা ভবনের ষষ্ঠ তলা, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	৮৩৯১১৮৭	০১৫৫০০৪২২১২
৩.	থানা নির্বাচন অফিসার, মতিঝিল, ঢাকা	১ম ১২ তলা ভবনের ষষ্ঠ তলা, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	৮৩৯১০৭১	০১৫৫০০৪২২২৪
৪.	থানা নির্বাচন অফিসার, কোতোয়ালি, ঢাকা	দিগন্ত টাওয়ার (৭ম তলা), ১২/১, আর কে মিশন রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ (ব্রাদার্স ক্লাবের বিপরীতে)	৯৫৮৯৬৬৩	০১৫৫০০৪২২২০
৫.	থানা নির্বাচন অফিসার, লালবাগ, ঢাকা	দিগন্ত টাওয়ার (৭ম তলা), ১২/১, আর কে মিশন রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ (ব্রাদার্স ক্লাবের বিপরীতে)	৯৫৮৯৬৬৬	০১৫৫০০৪২২২১
৬.	থানা নির্বাচন অফিসার, সূত্রাপুর, ঢাকা	দিগন্ত টাওয়ার (৭ম তলা), ১২/১, আর কে মিশন রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ (ব্রাদার্স ক্লাবের বিপরীতে)	৯৫৮৯৬৬২	০১৫৫০০৪২২২৯
৭.	থানা নির্বাচন অফিসার, সবুজবাগ, ঢাকা	হাজী আনোয়ার কমপ্লেক্স, ৬৯৮/ক/সি (৩য় তলা), খিলগাঁও, ঢাকা। (আনসার হেড কোয়ার্টারের নিকটে এবং খিলগাঁও গভ.কলোনি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিপরীতে)	৪৭২১০৪২৬	০১৫৫০০৪২২২৭
৮.	থানা নির্বাচন অফিসার, উত্তরা, ঢাকা	হাসান মাহমুদ কমপ্লেক্স (ষষ্ঠ তলা), আজমপুর কাঁচা বাজার দক্ষিণখান, ঢাকা।	৪৮৯৫৫৭৩০	০১৫৫০০৪২২৩১
৯.	থানা নির্বাচন অফিসার, মিরপুর, ঢাকা	ফ্ল্যাট নং-এল/৫/এফ, বাড়ি নং- ৩৪ (৫ম তলা), ব্লক-ডি, সেকশন-১১, মেইন রোড নং-৩, (পল্লবী, ঢাকা) (পূরবী সিনেমা হলের বিপরীতে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের উপরে)।	৯০২২১৮৮	০১৫৫০০৪২২২২
১০.	থানা নির্বাচন অফিসার, পল্লবী, ঢাকা	ফ্ল্যাট নং-এল/৫/ই, বাড়ি নং- ৩৪ (৫ম তলা), ব্লক-ডি, সেকশন-১১, মেইন রোড নং-৩, (পল্লবী, ঢাকা) (পূরবী সিনেমা হলের বিপরীতে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের উপরে)।	৯০২২১৩৩	০১৫৫০০৪২২২৬
১১.	থানা নির্বাচন অফিসার, ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা	১১০৩, রূপায়ণ নওফা প্লাজা, ফ্ল্যাট নং-ই-৩ (৪র্থ তলা), ইব্রাহিমপুর, কাফরুল, ঢাকা-১২০৬। (কচুক্ষেত বাজার সংলগ্ন মেইন রোডের পাশে)।	৯৮৩৪০৭০	০১৫৫০০৪২২১৩
১২.	থানা নির্বাচন অফিসার, ডেমরা, ঢাকা	পশ্চিম দোলাইরপাড় (তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল অফিস সংলগ্ন), শ্যামপুর, ঢাকা।	৭৪৫১৯১১	০১৫৫০০৪২২১৪
১৩.	থানা নির্বাচন অফিসার, ধানমণ্ডি, ঢাকা	রূপায়ণ প্রাইম, বাড়ি নং-২ (৩য় তলা), রোড নম্বর-৭, ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা। (গ্রীন রোড গ্রীন লাইফ হাসপাতালের নিকটে সোনালী ব্যাংক কর্পোরেট শাখা বিল্ডিংয়ের ৩য় তলা)	৯৬১৫৫৭০	০১৫৫০০৪২২১৬
১৪.	থানা নির্বাচন অফিসার, গুলশান, ঢাকা	আরমা মাজেদা মালিক টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং-এ-৬ (৭ম তলা), হোল্ডিং-খ-২১৫/১, প্রগতি সরণি, মেরুল বাড্ডা, ঢাকা (প্রগতি টাওয়ারের দক্ষিণে)।	৯৮৪০৯৪৮	০১৫৫০০৪২২১৮
১৫.	থানা নির্বাচন অফিসার, মোহাম্মদপুর, ঢাকা	২৩/৬, (১৬ তলা), ব্লক-বি, মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেট, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৭ (শ্যামলী আশা টাওয়ার সংলগ্ন-রূপায়ণ সেলফোর্ড)	৯১১৭৯১৬	০১৫৫০০৪২২২৩
১৬.	থানা নির্বাচন অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা	১৩/বি, সেন্টার পয়েন্ট, কনকর্ড (১৪ তলা), ফার্মগেট, ঢাকা (ফার্মগেট পুলিশ বক্সের পূর্ব পাশে)	৪৮১১০৫৩০	০১৫৫০০৪২২৩০
১৭.	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, ধামরাই, ঢাকা	উপজেলা পরিষদ ভবন সংলগ্ন, ধামরাই, ঢাকা।	৭৭৩০১৭৬	০১৫৫০০৪২২১৫
১৮.	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, দোহার, ঢাকা	উপজেলা পরিষদ ভবন সংলগ্ন, দোহার, ঢাকা।	৭৭৬৮০১২	০১৫৫০০৪২২১৭
১৯.	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা	উপজেলা পরিষদ ভবন সংলগ্ন, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।	৭৭৬৬১৬৬	০১৫৫০০৪২২১৯
২০.	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, নবাবগঞ্জ	উপজেলা পরিষদ ভবন সংলগ্ন, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।	৭৭৬৫০১৫	০১৫৫০০৪২২২৫
২১.	উপজেলা নির্বাচন অফিসার, সাভার, ঢাকা	উপজেলা পরিষদ ভবন সংলগ্ন, সাভার, ঢাকা।	৭৭৪১৬৯৪	০১৫৫০০৪২২২৮

ভোটার তালিকায় নতুন ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তি, স্থানান্তর, জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন, হারানো, মৃত ভোটারের নাম কর্তন কিংবা স্মার্টকার্ড পাওয়ার জন্য নিজ নিজ থানা/উপজেলা নির্বাচন অফিসে যোগাযোগ করতে হবে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন আসন্ন। তাই নতুন ভোটার হওয়ার ক্ষেত্রে কিংবা ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্রের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এ সংক্রান্ত সেবাপ্রাপ্তির তথ্য সাধারণ জনগণ ও সাংবাদিক উভয়েরই জানা থাকা ভালো।
তথ্যসূত্র: *বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন*

লেখক: রিপোর্টার, পিআইবি

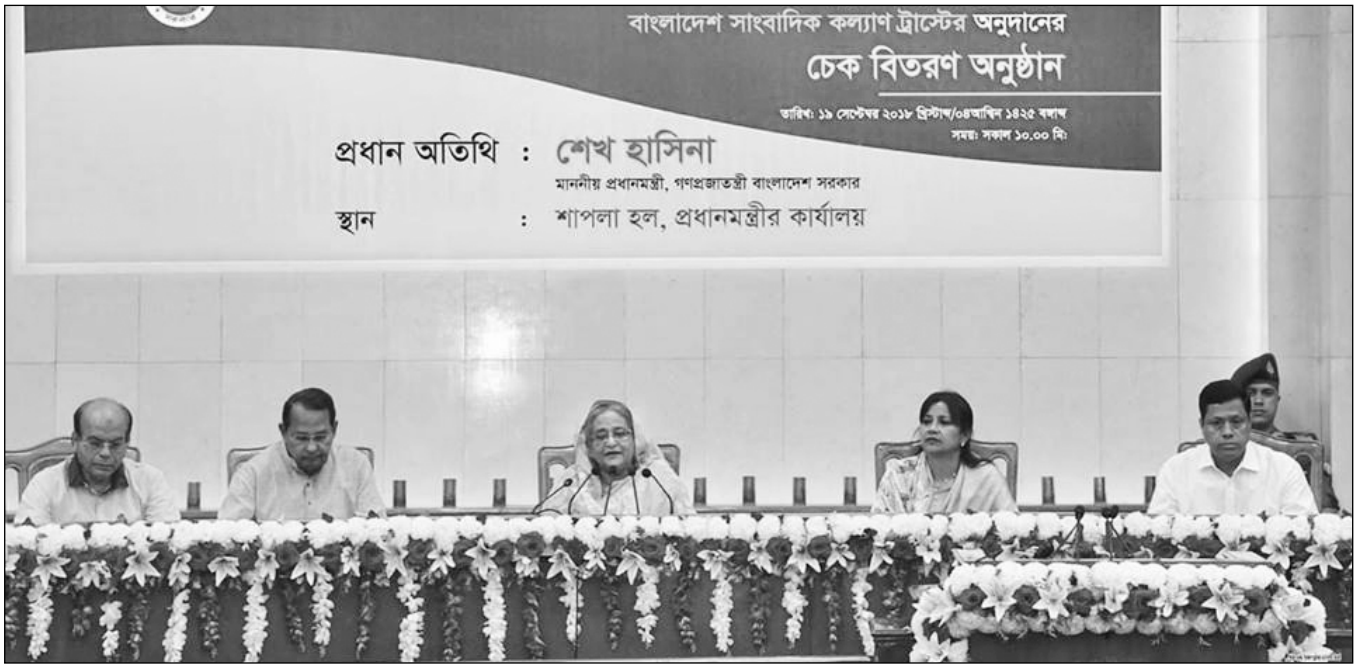

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয়ে অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ঘটনায় আহত সাংবাদিকদের মধ্যে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের তহবিল থেকে আর্থিক অনুদানের চেক প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন

আমরা সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী: প্রধানমন্ত্রী

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টে আরও ২০ কোটি টাকা অনুদান ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, স্বাধীনতা সবার আছে। সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকের স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী। এটা কেউ বলতে পারবে না কারোর গলা টিপে বা কারো মুখ টিপে ধরেছি। কাউকে বাধা দেওয়া হয়নি। বরং সাংবাদিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যা যা করণীয়, আমরা করেছি। সাংবাদিকতা পেশাকে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ও কল্যাণে ব্যবহারের আহ্বান জানান তিনি।

১৯ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী তাঁর কার্যালয়ে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে অসুস্থ, অসচ্ছল এবং দুর্ঘটনাজনিত আহত ও নিহত সাংবাদিক পরিবারের সদস্যদের অনুকূলে আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। কিন্তু এটাকে বালখিল্য বা বালকসুলভভাবে ব্যবহার করা উচিত নয় এবং সবারই এ ব্যাপারে সচেতন থাকা উচিত। দেশের জন্য কল্যাণজনক হবে– এমন ভূমিকাই গণমাধ্যমের পালন করা উচিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পর্কের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, আপনারা জানেন যে ছাত্রজীবন থেকে জাতির পিতার সংবাদপত্রের সঙ্গে একটা সম্পর্ক ছিল। প্রথমে ইত্তেহাদ নামে একটি পত্রিকা, তার আগে ছিল মিল্লাত নামে একটি পত্রিকা। এরপর ইত্তেফাক বের হলো। তিনি সব সময় এসব পত্রিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। নিজের হাতে ইত্তেফাক বিক্রি করার কাজও করেছেন এবং পূর্ববঙ্গের পক্ষ থেকে তিনি এসব পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশন করতেন। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনীতেও এ কথা লেখা রয়েছে। আত্মজীবনীর পৃষ্ঠা ৮৮তে স্পষ্ট লেখা আছে।

সরকারি চাকরি-ভাতা প্রদানসহ সাংবাদিকদের কল্যাণে বঙ্গবন্ধুর নেওয়া বিভিন্ন কার্যক্রমের কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। গণমাধ্যমকে সমাজের দর্পণ আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী জানান, অন্যান্য পেশাজীবীর মতো সাংবাদিক কল্যাণকে তাঁর সরকার অগ্রাধিকার দেয়। সাংবাদিক কল্যাণে তাঁর সরকার 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট' স্থাপন করে এর অওতায় অসুস্থ, অসচ্ছল, আহত ও নিহত সাংবাদিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের অনুদান দিয়ে আসছে। প্রধানমন্ত্রী এ সময় বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টে আরও ২০ কোটি টাকা অনুদান প্রদানের ঘোষণা দিয়ে বলেন, ২০ লাখ টাকার একটা ফান্ড করে দিয়েছিলাম। পরবর্তী সময়ে কল্যাণ ফান্ড করে দিলাম। এখন ফান্ডে ১৪ কোটি টাকা আছে। এই ফান্ডে আরও ২০ কোটি টাকা দেব। এ ফান্ডে সংবাদপত্র ও টেলিভিশন মালিকদের অনুদান দেওয়ারও আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, মাত্র দুজন মালিক দিয়েছেন। বাকিদের দেওয়ার অনুরোধ করব। আমাদের বলার পর মাত্র দুইজন দিয়েছেন। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু (ইত্তেফাক) ও অঞ্জন চৌধুরী।

সাংবাদিকদের আবাসন সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা এখন কিছু ফ্ল্যাট করছি, যেটা সামান্য টাকা দিয়ে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করে এই ফ্ল্যাটের মালিক হতে পারবেন। অনুষ্ঠানে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ১১৩ জন অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ঘটনাজনিত আহত সাংবাদিক এবং নিহত সাংবাদিক পরিবারের সদস্যদের হাতে অনুদানের চেক তুলে দেন শেখ হাসিনা। তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর তথ্যবিষয়ক উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, তথ্যপ্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম, তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি একেএম রহমতউল্লাহ, তথ্য সচিব মো. আবদুল মালেক, বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. শাহ আলমগীর, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি মোল্লা জালাল, মহাসচিব শাবান মাহমুদ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি (ডিইউজে) আবু জাফর সূর্য, সাধারণ সম্পাদক সোহেল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সূত্র: ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮, দৈনিক ইত্তেফাক

বিশ্বমানের চলচ্চিত্র নির্মাণে সহায়তা দেব : প্রধানমন্ত্রী

চলচ্চিত্র নির্মাতা, শিল্পী ও কলাকুশলীদের প্রতি বিশ্বমানের চলচ্চিত্র নির্মাণে মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন, তার জন্য যা যা সহায়তা লাগবে, তা দিতে প্রস্তুত রয়েছেন তিনি।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৬ প্রদান অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে ২৬ ক্যাটাগরিতে ২৯ শিল্পীকে পুরস্কৃত করা হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের সবসময় একটা কথা মনে রাখতে হবে, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ী জাতি হিসেবে আমরা বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে চলতে চাই। কোনো দিকেই আমরা পিছিয়ে থাকতে চাই না। শিল্পের দিক থেকে, বিশেষ করে চলচ্চিত্র শিল্পের দিক থেকেও আমরা যেন বিশ্বমানের চলচ্চিত্র করে এগিয়ে যেতে পারি। আর তার জন্য যা করা দরকার, আমার পক্ষ থেকে সবই আমি করব।'

চলচ্চিত্রে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পদক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সবদিক থেকেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই, আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পটাও আরও উন্নত হোক। এর জন্য ইতোমধ্যে অনেক পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি।' তিনি বলেন, 'চলচ্চিত্র মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি। সমাজে অনেক বার্তা পৌঁছানো যায়। অনেক কথা বলা যায়। সমাজ সংস্কারে অনেক বড়ো ভূমিকা রাখতে পারে এই চলচ্চিত্র।'

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর সভাপতিত্বে মঞ্চে আরও উপস্থিত ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ও তথ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি এ কে এম রহমত উল্লাহ। পুরস্কার দেওয়ার পর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেন প্রধানমন্ত্রী।

পুরস্কার পেলেন যারা: অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয়েছে ফরিদা আক্তার ববিতা ও আকবর হোসেন পাঠান ফারুককে। সেরা চলচ্চিত্র 'অজ্ঞাতনামা', সেরা পরিচালক অমিতাভ রেজা, সেরা অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী এবং যৌথভাবে সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন নুসরাত ইমরোজ তিশা ও কুসুম শিকদার।

শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'ঘ্রাণ' এবং শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছে 'জন্মসাথী'। শ্রেষ্ঠ পার্শ্বচরিত্রাভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন আলীরাজ ও ফজলুর রহমান বাবু। শ্রেষ্ঠ পার্শ্বচরিত্রাভিনেত্রী তানিয়া আহমেদ, শ্রেষ্ঠ খল অভিনেতা শহীদুজ্জামান সেলিম, শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী আনুম রহমান খান।

শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক ইমন সাহা, শ্রেষ্ঠ গায়ক ওয়াকিল আহমেদ, শ্রেষ্ঠ গায়িকা মেহের আফরোজ শাওন, শ্রেষ্ঠ সুরকার ইমন সাহা। শ্রেষ্ঠ কাহিনিকার তৌকীর আহমেদ, শ্রেষ্ঠ গীতিকার গাজী মাজহারুল আনোয়ার, শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতা রুবাইয়াত হোসেন, শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার অনম বিশ্বাস ও গাউসুল আলম। শ্রেষ্ঠ সম্পাদক ইকবাল আহসানুল কবির, শ্রেষ্ঠ শিল্প নির্দেশক উত্তম গুহ, শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক রাশেদ জামান, শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক রিপন নাথ। শ্রেষ্ঠ পোশাক ও সাজসজ্জার পুরস্কার উঠেছে সাত্তার ও ফারজানা সানের হাতে, আর শ্রেষ্ঠ মেকআপম্যানের পুরস্কার পেয়েছেন মানিক।

সূত্র: ৯ জুলাই ২০১৮, দৈনিক সমকাল

সম্পাদক পরিষদের সংলাপ

হুমকি ও ঝুঁকি বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ এবং অধিকারকর্মীরা সাংবাদিকদের জন্য আরও উন্নত নিরাপত্তার স্বার্থে একটি অভিন্ন নির্দেশনার রূপরেখার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন।

১২ জুলাই রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে সম্পাদক পরিষদ আয়োজিত 'সাংবাদিকদের নিরাপত্তাবিষয়ক এক আঞ্চলিক সংলাপ'-এ বক্তারা এ মন্তব্য করেন।

সংলাপে স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক, স্যাটেলাইট চ্যানেল, অনলাইনে কর্মরত সাংবাদিক, সাংবাদিক ইউনিয়নের নেতা, শিক্ষাবিদ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞরা অংশ নেন।

সাংবাদিকদের জন্য শারীরিক, মানসিক, আইনি এবং প্রযুক্তিগত বিষয়গুলোও যে গুরুত্বপূর্ণ, সংলাপে অংশগ্রহণকারীরা তা স্বীকার করেন। আলোচকরা সম্পাদক পরিষদ, নোয়াব, পিআইবি, সাংবাদিক ইউনিয়ন, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির মতো সংশ্লিষ্ট সব সংগঠনকে যুক্ত করে আলোচনার মাধ্যমে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা প্রটোকল চূড়ান্ত করার বিষয়ে একমত হয়েছেন।

সম্পাদকরা মনে করেন, নিরাপত্তা প্রটোকলের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে ভালো চর্চাগুলো ভিত্তি হওয়া উচিত, যা গণমাধ্যমগুলো গ্রহণ করে ব্যবহার করবে।

সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দূর করতে সরকার ও সরকারের বিভিন্ন সংস্থাকে যতটা সম্ভব ব্যবস্থা নিতে সংলাপ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

দিনব্যাপী আঞ্চলিক সেমিনারে ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া সাপোর্টের এশিয়াবিষয়ক আঞ্চলিক উপদেষ্টা শ্রীলংকার রঙ্গ কালানসুরিয়া, ভারতের অনুসন্ধানী সাংবাদিক ও লেখক রানা আইয়ুব এবং মিডিয়া লিগ্যাল ডিফেন্সের প্রধান নির্বাহী যুক্তরাজ্যের লুসি ফ্রিম্যান অংশ নেন।

প্রবীণ সাংবাদিক ও সম্পাদক পরিষদের সদস্য রিয়াজউদ্দীন আহমেদ সংলাপ সঞ্চালনা ও সভাপতিত্ব করেন। ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টার সম্পাদক ও প্রকাশক এবং সম্পাদক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ আনাম আলোচনার শুরুতে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন।

সূত্র: ১৩ জুলাই ২০১৮, দৈনিক প্রথম আলো

বিএফইউজে নির্বাচন

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মোল্লা জালাল। মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন শাবান

মাহমুদ। ২৮ জুলাই জাতীয় প্রেস ক্লাবে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেন সভাপতি পদে মোল্লা জালালকে বিজয়ী ঘোষণা করেন।

১৩ জুলাই ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের ভোট গ্রহণের পর অন্য পদগুলোয় নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা হলেও সভাপতি পদের তিন প্রার্থী হাতে ভোট গণনার আবেদন জানালে ওই পদে ফল স্থগিত রাখা হয়েছিল। বিএফইউজের এই অংশে সভাপতি মোল্লা জালালের সঙ্গে মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করবেন শাবান মাহমুদ। নির্বাচিত অন্যরা হলেন– সহসভাপতি সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, কোষাধ্যক্ষ দীপ আজাদ, দপ্তর সম্পাদক বরুণ ভৌমিক নয়ন, যুগ্ম মহাসচিব আবদুল মজিদ, নির্বাহী সদস্য শেখ মামুনূর রশীদ, নুরে জান্নাত আখতার সীমা, সেবিকা রানী ও খায়রুজ্জামান কামাল।

সূত্র: ২৯ জুলাই ২০১৮, দৈনিক ইত্তেফাক

ইআরএফের সভাপতি দিলাল সম্পাদক রাশেদ

অর্থনৈতিক রিপোর্টারদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন একুশে টেলিভিশনের প্ল্যানিং এডিটর সাইফুল ইসলাম দিলাল। সহসভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সৈয়দ শাহনেওয়াজ। সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সিনিয়র রিপোর্টার এসএম রাশিদুল ইসলাম।

১০ আগস্ট রাজধানীর পুরানা পল্টনে সংগঠনের নিজস্ব কার্যালয়ে দ্বিবার্ষিক সভা ও ২০১৮-১৯ মেয়াদে পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পরে নির্বাচন পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি শওকত মাহমুদ ফল ঘোষণা করেন। ইআরএফের ১৮৭ ভোটারের মধ্যে ১৭০ জন ভোট দেন।

এদিকে সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে বাংলা ভিশনের গোলাম মঈনুল আহসান, অর্থ সম্পাদক পদে প্রতিদিনের সংবাদের শাহজাহান সিরাজ সাজু

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়া চারটি সদস্য পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের দৌলত আক্তার মালা, নয়া দিগন্তের আশরাফুল ইসলাম, এসএ টেলিভিশনের সালাহউদ্দিন বাবলু এবং সুনীতি কুমার বিশ্বাস।

নির্বাচন পরিচালনা বোর্ডে সদস্য হিসেবে ছিলেন একুশে টিভির প্রধান নির্বাহী মনজুরুল আহসান বুলবুল ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফরিদা ইয়াসমিন।

সূত্র: ১১ আগস্ট ২০১৮, দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিতারা পারভীন পুরস্কার পেলেন ১০ শিক্ষার্থী

'অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার' পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ১০ শিক্ষার্থী। ২০১৭ সালের বিএসএস সম্মান পরীক্ষায় ভালো ফল করায় এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

২৩ জুলাই এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিসি অধ্যাপক আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিকবিজ্ঞান অনুষদের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে। গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারপারসন অধ্যাপক কাবেরী গায়েনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে 'কেন নাটক?' শীর্ষক 'অধ্যাপক সিতারা পারভীন স্মারক বক্তৃতা' দেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিভাগের অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলী।

পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন রাগিব রহমান, সঞ্জয় বসাক পার্থ, ফারজানা তাসনীম পিংকী, জাকিয়া জাহান মুক্তা, শামিম হোসেন, ওয়াহিদা জামান শিথী, সাইয়্যেদুজ্জামান, জিনাত শারমিন, দায়েদ হাসান ও দুর্জয় চক্রবর্তী।

সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের মেয়ে এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী অধ্যাপক সিতারা পারভীন ২০০৫ সালের ২৩ জুন যুক্তরাষ্ট্রে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। তার স্মৃতির উদ্দেশে পরিবারের পক্ষ থেকে অধ্যাপক সিতারা পারভীন পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়।

সূত্র: ২৪ জুলাই, দৈনিক কালের কণ্ঠ

১১ সাংবাদিক পেলেন ইআরএফ পুরস্কার

অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সেরা রিপোর্টিং পুরস্কার-২০১৮ পেলেন ১১ সাংবাদিক। রাজধানীর পুরানা পল্টনে ইআরএফ কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সাংবাদিকদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন।

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সেবা প্রতিবেদন পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মহিত, সংগঠনের নেতা ও পুরস্কারপ্রাপ্তরা

দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন ও টেলিভিশন বিভাগে আলাদাভাবে পুরস্কার দেওয়া হয়। এর মধ্যে দৈনিক পত্রিকা শ্রেণিতে ব্যাংক-বিমা, শেয়ারবাজার ও কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে সেরা প্রতিবেদনের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন প্রথম আলোর তিন সাংবাদিক। বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারি নিয়ে প্রতিবেদনের জন্য ব্যাংক-বিমা শ্রেণিতে প্রথম আলোর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক ফখরুল ইসলাম, '৯৬ সালে শেয়ার কেলেঙ্কারির জন্য বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানের দুই মামলা বাতিল নিয়ে প্রতিবেদনের জন্য প্রথম আলোর বাণিজ্য সম্পাদক সুজয় মহাজন ও অপ্রচলিত পণ্য নারিকেলের ছোবড়া বিদেশে রপ্তানি বিষয়ে প্রতিবেদনের জন্য প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক শুভংকর কর্মকার তিন বিভাগের সেরা প্রতিবেদনের পুরস্কার পান। কৃষি অর্থনীতি নিয়ে সেরা প্রতিবেদন শ্রেণিতে শুভংকর কর্মকারের সঙ্গে যৌথ অংশীদার ছিলেন ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি স্টারের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক সোহেল পারভেজ।

এছাড়া দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন বিভাগে সেরা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পুরস্কার জিতেছেন দৈনিক সমকালের ওবায়দুল্লাহ রনি। সাধারণ অর্থনীতি ও বেসরকারি খাত বিষয়ে সেরা প্রতিবেদনের পুরস্কার জিতেছেন দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের জসিম উদ্দিন।

টেলিভিশন বিভাগে অনুসন্ধানী শ্রেণিতে চ্যানেল ২৪-এর বার্তা সম্পাদক আবদুল কাইয়ুম, ব্যাংক-বিমায় যমুনা টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আলমগীর হোসেন, কৃষি অর্থনীতিতে গাজী টেলিভিশনের প্রধান প্রতিবেদক রাজু আহমেদ, পুঁজিবাজার শ্রেণিতে যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা ও সাধারণ অর্থনীতিতে এসএ টেলিভিশনের সালাউদ্দিন বাবলু।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকতা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সাংবাদিকরা বস্তুনিষ্ঠতা ও সততার সঙ্গে যে কোনো অনিয়ম, ভুলত্রুটি তুলে ধরবেন– এটাই আমাদের প্রত্যাশা। পাশাপাশি যখন কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয়, তখন যেন অভিযুক্তের বক্তব্যও প্রতিবেদনে স্থান পায় এবং সেটি নিশ্চিত করা হয়।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে ইআরএফের সভাপতি সাইফ ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমানসহ সংগঠনটির বর্তমান ও সাবেক নেতা এবং সাধারণ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: ২ আগস্ট ২০১৮, দৈনিক প্রথম আলো

১০ সাংবাদিক পেলেন রিহ্যাব পুরস্কার

দেশের আবাসন ব্যবসায়ীদের সংগঠন রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (রিহ্যাব) বর্ষসেরা সাংবাদিক পুরস্কার পেয়েছেন সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেলের ১০ সাংবাদিক। এছাড়া পুরস্কার পেয়েছেন টেলিভিশন চ্যানেলের ১৪ চিত্রগ্রাহকও। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ২০ সেপ্টেম্বর রিহ্যাব বর্ষসেরা সাংবাদিক পুরস্কার ২০১৬ তুলে দেন গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রিহ্যাবের সভাপতি আলমগীর শামসুল আলামিন, জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি নূরুন্নবী চৌধুরী, সহসভাপতি লিয়াকত আলী ভূঁইয়া ও পরিচালক কামাল মাহমুদ। সংবাদপত্র বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন প্রথম আলোর সানাউল্লাহ সাকিব, সমকালের মিরাজ শামস, মানবজমিনের এসএম মাসুদ, আমাদের সময়ের গোলাম রব্বানী ও ভোরের কাগজের মরিয়ম সেঁজুতি। টেলিভিশন চ্যানেল বিভাগে পুরস্কার পেয়েছেন মাছরাঙা টিভির হিরফুন মিরা, এনটিভির হাসানুল শাওন, একাত্তর টিভির জাহিদুল ইসলাম, মোহনা টিভির তানজিলা নিঝুম ও সময় টিভির সানবীর রূপল।

সূত্র: ২১ সেপ্টেম্বর, দৈনিক প্রথম আলো

পর্যটন ফেলোশিপ পেলেন ১০ সাংবাদিক

পর্যটনবিষয়ক প্রতিবেদনের মাধ্যমে এ খাতের উন্নয়নে অবদান রাখায় বিভিন্ন গণমাধ্যমের ১০ সাংবাদিককে 'পর্যটন ফেলোশিপ-২০১৮' দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড (বিটিবি) ও বাংলাদেশ এভিয়েশন অ্যান্ড ট্যুরিজম জার্নালিস্ট ফোরাম (এটিজেএফবি) যৌথভাবে এ ফেলোশিপের আয়োজন করে।

১৫ আগস্ট রাজধানীর জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের সার্টিফিকেট ও চেক (প্রত্যেককে ৬০ হাজার টাকা) দেন বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এম মহিবুল হক।

ফেলোশিপপ্রাপ্তরা হলেন– আলতাব হোসেন (সমকাল) ইমরুল কাওসার ইমন (ভোরের ডাক), একেএম মঈনুদ্দিন (ইউএনবি), মাসুদ রুমি (কালের কণ্ঠ), জামাল উদ্দিন (ইত্তেফাক), তৌহিদুল ইসলাম (আমাদের সময়), জিয়াউল হক সবুজ (বাংলা ভিশন), ইমতিয়াজ আহমেদ (সময় টিভি), দিনার সুলতানা (বিটিভি) এবং ফারহানা নীলা (মোহনা টিভি)।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বিটিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেন, দ্য বাংলাদেশ মনিটর সম্পাদক কাজী ওয়াহিদুল আলম, ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (টোয়াব)-এর পরিচালক তৌফিক রহমান, বিটিবির উপব্যবস্থাপক আকতার আহমেদ, এটিজেএফবির সভাপতি নাদিরা কিরণ এবং সাধারণ সম্পাদক তানজিম আনোয়ার।

সূত্র: ১৫ আগস্ট, দৈনিক সমকাল

এনটিভির বর্ষপূর্তি

৩ জুলাই বেসরকারি স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল এনটিভি ১৬ বছরে পদার্পণ করেছে। 'সময়ের সাথে আগামীর পথে' স্লোগান নিয়ে ২০০৩ সালের ৩ জুলাই যাত্রা শুরু করে চ্যানেলটি। পরের বছর ১ জানুয়ারি থেকে ২৪ ঘণ্টায় সম্প্রচার শুরু করে তারা। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে চ্যানেলটি।

সূত্র: ৩ জুলাই, দৈনিক প্রথম আলো

ঢাবি সাংবাদিকতা বিভাগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

বর্ণাঢ্য ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৬তম গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ দিবস উদযাপন করা হয়েছে। ২ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাবেরী গায়েনের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান।

শোভাযাত্রাটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের মোজাফফর আহমদ মিলনায়তনে আলোচনা সভায় বসে। এখানে 'ডিইউএমসিজেএডুডটকম' ও 'ডিইউএমসিজেনিউজডটকম' নামে দুটি ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করা হয়। প্রথম ওয়েবসাইটটিতে সাংবাদিকতা বিভাগ সম্পর্কে সব ধরনের তথ্য জানা যাবে এবং দ্বিতীয় ওয়েবসাইটটিতে বিভাগের শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে সাংবাদিকতার চর্চা করতে পারবে। আলোচনা সভায় 'গণমানুষ, গণমাধ্যম, গণতন্ত্র' শিরোনামে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। এছাড়া অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, অধ্যাপক সাখাওয়াত আলী খান, অধ্যাপক আখতার সুলতানা, অধ্যাপক গোলাম রহমান, অধ্যাপক আহাদুজ্জামান মোহাম্মদ আলীসহ বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, গণমাধ্যমের শক্তি বাড়ছে। গণমাধ্যমের ওপর আক্রমণ, নিয়ন্ত্রণও বাড়ছে। বাংলাদেশে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি; কিন্তু গণমাধ্যমের নিয়ন্ত্রণ আছে। সংবাদপত্র প্রকাশ করতে হলে অনুমতি নিতে হয়। সেই অনুমতি নেওয়া সহজ নয়। অনুমতি পেলেও চালু রাখা সম্ভব নয়। নীরবে নিয়ন্ত্রণ চলছে আত্মনিয়ন্ত্রণ চলছে।

সূত্র: ৪ আগস্ট ২০১৮, দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাবি সাংবাদিক সমিতির ৩৩ বছর পূর্তি উদযাপন

'তথ্যে তারুণ্যে নিত্য সত্যে' স্লোগানকে ধারণ করে ৩৪ বছরে পদার্পণ করল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি (ডুজা)। ১৯ সেপ্টেম্বর সংগঠনটির ৩৩ বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়।

সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। শোভাযাত্রায় সমিতির সব সদস্য টিএসসি প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করেন। পরে টিএসসিতে অবস্থিত সমিতির কার্যালয়ে বর্ধিত পরিসরে শহিদ চিশতী স্মৃতি পাঠাগার উদ্বোধন করেন ভিসি এবং কেক কেটে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করেন।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সামাদ, সমিতির সভাপতি আসীফ ত্বাসীন, সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হাসান নয়ন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুল হাকিম আবির, দপ্তর সম্পাদক রায়হানুল ইসলাম আবির, অর্থ সম্পাদক আবদুল করিম, কার্যকরী সদস্য মাহদী আল মুহতাসিম নিবিড়, মুনির হোসাইনসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: ২০ সেপ্টেম্বর, দৈনিক সমকাল

বর্ণাঢ্য আয়োজনে স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলকে সম্মাননা জানাল নিউজটোয়েন্টিফোর

তৃতীয় বর্ষে পা রাখল বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন নিউজটোয়েন্টিফোর। ২৮ জুলাই স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলকে সম্মান জানায় টেলিভিশন চ্যানেলটি। নিউজটোয়েন্টিফোরের পক্ষ থেকে ফুটবল দলের প্রত্যেক সদস্যের হাতে ক্রেস্ট ও ৫০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এবং বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান। উপস্থিত ছিলেন বসুন্ধরা গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সায়েম সোবহান আনভীর এবং তার ছেলে ওয়াসিম সোবহান। কেক কাটার মধ্য দিয়ে শুরু হয় বর্ষপূর্তি উদযাপন। রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরার (আইসিসিবি) রাজদর্শন মিলনায়তন তাই নানা বর্ণে, ছন্দে আনন্দময় হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। শুভেচ্ছা জানান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, জাতীয় পার্টির কো-চেয়ারম্যান জিএম কাদের, মহাসচিব এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদারসহ শুভানুধ্যায়ীরা।

সূত্র: ২৯ জুলাই, দৈনিক কালের কণ্ঠ

২২ বছরে এটিএন বাংলা

এটিএন বাংলা ২২ বছরে পদার্পণ করেছে। এ উপলক্ষ্যে সারা দিন নানা অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। সকাল থেকেই রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এটিএন বাংলা কার্যালয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের শুভেচ্ছা গ্রহণ করা হয়। বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে একটি টেলিছবি তৈরি হয়েছে। নাম– 'একটি সাজানো বাগানের গল্প'।

'অবিরাম বাংলার মুখ' স্লোগান নিয়ে ১৯৯৭ সালের ১৫ জুলাই যাত্রা শুরু করে এটিএন বাংলা। দেশের অন্যতম জনপ্রিয় এই টিভি চ্যানেল থেকে জানানো হয়েছে, দর্শকদের ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে চলেছে এটিএন বাংলা। বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ আর মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যমে দর্শকদের মাঝে নিজেদের মজবুত অবস্থান অক্ষুণ্ন রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এটিএন বাংলা।

সূত্র: ১৪ জুলাই, দৈনিক প্রথম আলো

পাবনায় সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা

বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল 'আনন্দ টিভির' পাবনা প্রতিনিধি সুবর্ণা নদীকে (৩২) কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। ২৮ আগস্ট তার বাসায় কলিংবেল টিপে কয়েকজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। সুবর্ণা গেট খোলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অতর্কিত এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ফেলে পালিয়ে যায় তারা। পরে তাকে উদ্ধার করে পাবনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

সূত্র: ২৯ আগস্ট, দৈনিক ইত্তেফাক

শোক সংবাদ

গোলাম সারওয়ার

বাংলাদেশের সাংবাদিকতা জগতের পথিকৃৎ, সমকাল সম্পাদক ও পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান গোলাম সারওয়ার (৭৫) সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে ১৩ আগস্ট চিকিৎসাধীন

অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

হৃদরোগের পাশাপাশি নিউমোনিয়া ও ফুসফুসে পানি জমে যাওয়ায় ২৯ জুলাই ঢাকার ল্যাবএইড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল গোলাম সারওয়ারকে। এরপর উন্নত চিকিৎসার জন্য ৩ আগস্ট তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে নেওয়া হয় সিঙ্গাপুরে। ভর্তি করা হয় সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে। সমকালের নির্বাহী সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি বলেন, সিঙ্গাপুরে শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছিল। নিউমোনিয়া সংক্রমণ হ্রাসের পাশাপাশি ফুসফুসে জমে থাকা পানিও কমেছিল। হার্টও স্বাভাবিকভাবে কাজ করছিল। কিন্তু রোববার হঠাৎ তার রক্তচাপ কমে যায়। কিডনিও স্বাভাবিকভাবে কাজ করছিল না। এ অবস্থায় সোমবার বিকালে তাকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। বাংলাদেশ সময় রাত ৯টা ২৫ মিনিটে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন সময়ে গোলাম সারওয়ারের সঙ্গে তার স্ত্রী সালেহা সারওয়ার, দুই ছেলে গোলাম শাহরিয়ার রঞ্জন ও গোলাম সাব্বির অঞ্জন এবং জামাতা মিয়া নাইম হাবিব অবস্থান করছিলেন।

বরিশালের বানারীপাড়ায় মরহুম গোলাম কুদ্দুস মোল্লা ও মরহুম সিতারা বেগম দম্পতির জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে ১৯৪৩ সালের ১ এপ্রিল গোলাম সারওয়ার জন্মগ্রহণ করেন। বানারীপাড়া হাইস্কুল, চাখার ফজলুল হক কলেজে উচ্চমাধ্যমিক শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। ১৯৬২ সালে চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদীর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা হিসেবে সাংবাদিকতা শুরু তার। ওই বছরই দৈনিক সংবাদের সহ-সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার পর বানারীপাড়ায় ফিরে কয়েক মাস বানারীপাড়া ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশনে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন গোলাম সারওয়ার। কিন্তু সেটা যে তার ক্ষেত্র ছিল না, তা স্পষ্ট হয় তার পরবর্তী পদক্ষেপে। ১৯৭২ সালে তিনি যোগ দেন দৈনিক ইত্তেফাকে। এই সংবাদপত্রটিতে বার্তা সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদে একাধারে ২৭ বছর কাজ করেছেন তিনি। পাশাপাশি ইত্তেফাক গ্রুপের সিনে ম্যাগাজিন পূর্বাণীর নির্বাহী সম্পাদকও ছিলেন তিনি। ইত্তেফাক ও গোলাম সারওয়ার একসূত্রে গাঁথা– সংবাদ জগতে আলোচিত এই কথার ছেদ ঘটিয়ে ১৯৯৯ সালে সম্পাদক হিসেবে নতুন অধ্যায় শুরু করেন গোলাম সারওয়ার। ২০০০ সালের পহেলা ফেব্রুয়ারি প্রকাশ হওয়া যুগান্তরকে অল্পদিনেই প্রচার সংখ্যার দিকে সামনের সারিতে নিয়ে আসেন। এরপর ২০০৫ সালের মে মাসে সমকাল প্রকাশিত হয় তার হাত ধরেই। মাঝে কিছু দিনের জন্য যুগান্তরে ফিরলেও পরে আবার ফিরে আসেন সমকালে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সমকালের সম্পাদক ছিলেন তিনি। ২০১৫ সালের ৮ আগস্ট থেকে পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে পিআইবিতে শোক বই খোলা হয়।

গোলাম সারওয়ার দেশের প্রতিনিধিত্বশীল সম্পাদকদের সংগঠন সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ছিলেন। জাতীয় প্রেস ক্লাবের ব্যবস্থাপনা পর্ষদেও একাধিকবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি। ছিলেন ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের আপিল বিভাগেও। সাংবাদিকতায় অবদানের জন্য ২০১৪ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন। 'সম্পাদকের জবানবন্দি', 'অমিয় গরল', 'আমার যত কথা' ও 'স্বপ্ন বেঁচে থাক' নামে তার চারটি প্রবন্ধ সংকলন রয়েছে গোলাম সারওয়ারের। বাংলা একাডেমি থেকে 'রঙিন বেলুন' নামে একটি ছড়ার বইও বেরিয়েছে বাতিঘর খ্যাত এই সম্পাদকের।

- নিরীক্ষা ডেস্ক

মোয়াজ্জেম হোসেন

ইংরেজি দৈনিক 'ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস'-এর সম্পাদক এএইচএম মোয়াজ্জেম হোসেন (৭৩) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। ১ আগস্ট একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। কিছুদিন ধরে নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন দেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক মোয়াজ্জেম হোসেন। শেষ কয়েক দিন স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। ২ আগস্ট জোহরের পর আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

সম্পাদকের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনস লিমিটেডের (আইপিএল) প্রকাশক ছিলেন মোয়াজ্জেম হোসেন। ইংরেজি দৈনিকটির প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি।

প্রথিতযশা এই সাংবাদিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন ১৯৬৭ ও ১৯৬৮ সালে। সাংবাদিক হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু হয় বাংলাদেশ অবজারভারে। এছাড়া তিনি নিউ নেশন, ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি), ঢাকা কুরিয়ার এবং ডেইলি স্টারে কর্মরত ছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ালেখা শেষে মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৬৮ সালে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে হাবিব ব্যাংকে কর্মজীবন শুরু করেন। পাকিস্তান সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের গবেষণা বিভাগেও কাজের অভিজ্ঞতা ছিল তার। তিনি ১৯৯৫ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন। এ ছাড়া ১৯৯৭ থেকে ২০০০ সালে তিনি বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯২ সালে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন তিনি। মোয়াজ্জেম হোসেন দেশের অর্থনৈতিক রিপোর্টের একজন অগ্রণী সাংবাদিক।

মোয়াজ্জেম হোসেন টানা দুই মেয়াদে রাষ্ট্রমালিকানাধীন জনতা ব্যাংকের পরিচালক ছিলেন। এছাড়া ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড, বে লিজিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট এবং সাউথইস্ট ব্যাংকের পরিচালক ছিলেন তিনি।

সূত্র: ২ আগস্ট, দৈনিক প্রথম আলো

মোস্তাক হোসেন

খ্যাতিমান সাংবাদিক, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাবেক সভাপতি মোস্তাক হোসেন (৫৮) জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতালে ৩ সেপ্টেম্বর চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)।

সাংবাদিক মোস্তাক হোসেন আজকের কাগজসহ বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বশেষ তিনি দৈনিক ভোরের ডাক পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন। মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়।

সূত্র: ৪ সেপ্টেম্বর, দৈনিক কালের কণ্ঠ

কুলদীপ নায়ার

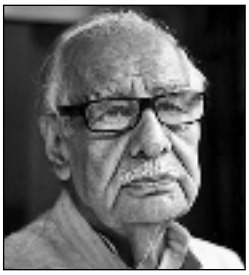

ভারতের প্রবীণ সাংবাদিক, লেখক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক কুলদীপ নায়ার (৯৫) আর নেই। ২২ আগস্ট দিল্লির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বহুদর্শী এই ব্যক্তিত্বের জীবনাবসান ঘটে। কুলদীপ নায়ারের জন্ম ১৯২৩ সালের ১৪ আগস্ট ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে (বর্তমান পাকিস্তান)। আইন শাস্ত্রে লেখাপড়া করেও তিনি কর্মজীবন শুরু করেন উর্দু পত্রিকা দৈনিক আনজামের প্রতিবেদক হিসেবে। এরপর দীর্ঘ কর্মজীবনে নিজের পরিচয়কে তিনি বিস্তৃত করেছেন বহুমাত্রায়।

ভারতের ইংরেজি দৈনিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এবং স্টেটসম্যান সম্পাদনা করা কুলদীপ নায়ার ছিলেন সেসব সাংবাদিকের একজন, যারা সত্তরের

দশকে ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে জরুরি অবস্থা জারির বিরোধিতায় সরব হয়েছিলেন। প্রতিবাদী হওয়ায় তাকে কারাগারেও যেতে হয়েছিল।

কুলদীপ নায়ার নব্বইয়ের দশকের শুরুতে যুক্তরাজ্যে ভারতের হাইকমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৭ সালে রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। ধর্মীয় উগ্রবাদের পাশাপাশি উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধিতায় সরব এই কলামিস্ট শেষ বয়সে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ছিলেন তার রাজনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য।

তিনি মনে করতেন, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের পাশাপাশি পাকিস্তানের সঙ্গেও ভারতের দূরত্ব কমিয়ে আনা প্রয়োজন।

গণতন্ত্রকামী এই অধিকারকর্মী তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে লিখে গেছেন ১৫টি বই। তার আত্মজীবনী 'বিয়ন্ড দ্য লাইনসে' ব্যক্তি কুলদীপ নায়ারের বেড়ে ওঠার গল্পের সঙ্গে ধরা পড়েছে ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহাসিক নানা বাঁক বদলের কথা।

দক্ষিণ দিল্লির লোধি শ্মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

আনিস আহমেদ

ডেইলি অবজারভারের নির্বাহী সম্পাদক আনিস আহমেদ (৬৪) ২ জুলাই রাজধানীর মোহাম্মদপুরে মোহাম্মদী হোমস লিমিটেড এলাকায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন কিডনিসহ নানা রোগে ভুগছিলেন।

জাতীয় প্রেস ক্লাব চত্বরে আনিস আহমেদের প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে তার মরদেহ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শাহবাজপুরে নিজ গ্রামে নেওয়া হয়। সেখানে বাদ মাগরিব দ্বিতীয় জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। আনিস আহমেদ বার্তা সংস্থা বাসস, রয়টার্সসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

রানী সরকার

ঢাকাই চলচ্চিত্রের সোনালি দিনের নন্দিত অভিনেত্রী রানী সরকার (৮৬) মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ফুসফুস ও বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। রানী সরকারের শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে ৭ জুলাই ধানমন্ডির ইডেন মাল্টি কেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে রানী সরকারের মরদেহ এফডিসিতে নেওয়া হয়। সেখানে চলচ্চিত্রের অভিনয়শিল্পী ও অন্য কলাকুশলীরা তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। এরপর আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয় তাকে।

চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য ২০১৬ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয় তাকে। সাতক্ষীরা জেলার কালীগঞ্জ থানার সোনাতলা গ্রামে জন্ম রানী সরকারের। তার আসল নাম মোসাম্মৎ আমিরুন নেসা খানম। তার বাবার নাম সোলেমান মোল্লা এবং মায়ের নাম আছিয়া খাতুন।

১৯৫৮ সালে 'বঙ্গের বর্গী' মঞ্চনাটকের মাধ্যমে রানী সরকার অভিনয়-জীবন শুরু করেন। ১৯৫৮ সালে রানী সরকারের চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় এ জে কারদার পরিচালিত 'দূর হ্যায় সুখ কা গাঁও' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। ১৯৬২ সালে বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার এহতেশামুর রহমান পরিচালিত উর্দু চলচ্চিত্র 'চান্দা'তে অভিনয় করেন। সেই চলচ্চিত্রের পর থেকে তার নাম মেরীর বদলে হয় রানী সরকার। পরে উর্দু ছায়াছবি তালাশ ও বাংলা ছবি নতুন সুরে কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রে অভিনয় করেন। এ ছবি দুটিও বেশ জনপ্রিয় হয়। এরপর তিনি ২৫০টিরও বেশি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। একজন নৃত্যশিল্পী হিসেবেও রানী সরকার জনপ্রিয় ছিলেন।

মামুনুর রশীদ

একুশে টেলিভিশনের প্রতিবেদক ও প্রধানমন্ত্রী বিটে কর্মরত সাংবাদিক মামুনুর রশীদ মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি ৩ সেপ্টেম্বর বাসায় ঘুমের মধ্যে স্ট্রোক করেন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর উপপ্রেস সচিব আশরাফুল আলম খোকন। তিনি জানান, রাত ১১টার দিকে জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মামুনকে মৃত ঘোষণা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে পড়াশোনা শেষ করে মামুন এর আগে এশিয়ান টেলিভিশনে কর্মরত ছিলেন।

ইকবাল হোসেন

সমকালের রংপুর ব্যুরোপ্রধান ইকবাল হোসেন (৪৪) শহরের মাহিগঞ্জ দেওয়ানটুলির বাসভবনে ১২ সেপ্টেম্বর ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন।

ইকবাল হোসেনের মৃত্যুতে সমকাল প্রকাশক এ কে আজাদ ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি গভীর শোক প্রকাশ এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

ইকবাল হোসেন ১৯৭৪ সালে রংপুরের কোতোয়ালি থানার দেওয়ানটুলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা আবদুল খালেক। ইকবাল হোসেন সমকালের পাশাপাশি দীপ্ত টিভির জেলা প্রতিনিধি হিসেবেও কর্মরত ছিলেন। এর আগে তিনি ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক খবর ও দৈনিক পরিবেশ পত্রিকায় কাজ করেন। এছাড়া বাংলাদেশ বেতারের রংপুর কেন্দ্রের বার্তা বিভাগে কাজ করতেন।

বাদ জোহর দেওয়ানটুলি স্কুলমাঠে জানাজা শেষে তাকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।

রেবা রহমান

দৈনিক ইনকিলাবের যশোর অফিসের স্টাফ রিপোর্টার রেবা রহমান ৪ আগস্ট যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ... রাজিউন)। শহরের খয়েরতলায় পারিবারিক কবরস্থানে তার লাশ দাফন করা হয়। তিনি ইনকিলাবের যশোর অফিসের বিশেষ প্রতিনিধি ও যশোর প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান তোতার স্ত্রী। *নিরীক্ষা ডেস্ক*

অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অব জার্নালিজম-এর সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী, অতিথিসহ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা

গণমাধ্যম রাষ্ট্র ও সমাজের প্রহরী: তথ্যমন্ত্রী

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেছেন, গণতন্ত্রকে বিকশিত করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে গণমাধ্যমকর্মীদের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন, গণমাধ্যম রাষ্ট্র ও সমাজের প্রহরী হিসেবে কাজ করে।

তিনি বলেন, গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম হাতের এপিঠ-ওপিঠ। গণতন্ত্রকে বিকশিত করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়া তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সমগ্র সমাজ একটি ঝকঝকে কাচের ঘরে রূপান্তরিত হচ্ছে, যা রাষ্ট্রের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করছে।

১২ জুলাই প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এবং একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বাংলাদেশে প্রথমবার অনলাইনে সাংবাদিকতা শেখার ই-লার্নিং কার্যক্রমে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

রাজধানীর ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) মিলনায়তনে সমকাল সম্পাদক ও পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান গোলাম সারওয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর, একসেস টু ইনফরমেশন প্রোগ্রামের পলিসি স্পেশালিস্ট আফজাল হোসেন সারওয়ার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক মফিজুর রহমান।

উলিপুরে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর উদ্যোগে কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (৩১ জুলাই থেকে ২ আগস্ট ২০১৮) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসক সুলতানা পারভীন। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। প্রশিক্ষণে মোট ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

অনলাইন সার্টিফিকেট কোর্স অন জার্নালিজম শীর্ষক প্রোগ্রামে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য তিন দিনব্যাপী (১১-১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-পিআইবি'তে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৩ সেপ্টেম্বর প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-এর প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কালাম আজাদ। পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বঙ্গবন্ধু গবেষক ইতালির নাগরিক আন্না কোক্কিয়ারেল্লা, নিউজ টোয়েন্টিফোরের যুগ্ম বার্তা সম্পাদক আঙুর নাহার মন্টি ও একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই)-এর সংযুক্ত কর্মকর্তা কবির হোসেন।

পিআইবি'তে সংসদবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) সাংবাদিকদের জন্য তিন দিনব্যাপী (১২-১৪ আগস্ট ২০১৮) সংসদবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ আগস্ট প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্যবিষয়ক উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, বিশেষ অতিথি দৈনিক ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত ও গাজী মিডিয়ার এডিটর-ইন চিফ সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর।

সংসদ বিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ সমাপন অনুষ্ঠানে (বাঁ থেকে) দৈনিক ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্যবিষয়ক উপদেষ্টা ইকবাল সোবহান চৌধুরী, পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর, গাজী মিডিয়ার এডিটর-ইন চিফ সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা এবং পিআইবি'র পরিচালক (অধ্যয়ন ও প্রশিক্ষণ) বেগম আনোয়ারা বেগম

ফেসবুকে গুজব নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে তথ্যমন্ত্রীসহ আগত অতিথিরা

ফেসবুকে গুজব নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক

'ফেসবুকে গুজব এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠক ১৯ আগস্ট প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-পিআইবি'তে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিআইবি ও ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম সেন্টার বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, গুজব রটনাকারীরা গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের শত্রু। ফেসবুকসহ সব সামাজিক মাধ্যমে মিথ্যাচার ও গুজব রটনাকারীদের শক্তভাবে দমন করা হবে। তবে সরকার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম খোলা রাখার পক্ষে। পিআইবির মহাপরিচালক শাহ আলমগীরের সভাপতিত্বে বৈঠকে আরও বক্তব্য দেন একুশে টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক মনজুরুল আহসান বুলবুল, গাজী টিভির প্রধান সম্পাদক সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা, সাংবাদিক নেতা দীপ আজাদ প্রমুখ।

চট্টগ্রামে প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে মতবিনিময়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে গণমাধ্যমকর্মী ও সচেতন নাগরিকদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা ১০ জুলাই চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব আবদুল মালেক। চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাব সভাপতি কলিম সরওয়ারের সভাপতিত্বে এবং পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীরের সঞ্চালনায় সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবুল মোমেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. হাবিবুর রহমান, চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের (সিইউজে) সভাপতি নাজিম উদ্দিন শ্যামল, সাধারণ সম্পাদক হাসান ফেরদৌস, প্রেস ক্লাব সাধারণ সম্পাদক শুকলাল দাশ প্রমুখ।

রাজবাড়ীতে অনুসন্ধানমূলক এবং শিশু ও নারীবিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আয়োজিত রাজবাড়ী জেলার সাংবাদিকদের জন্য দুই দিনব্যাপী (২৭-২৮ আগস্ট) শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং তিন দিনব্যাপী (২৭-২৯ আগস্ট) অনুসন্ধানমূলক প্রশিক্ষণ রাজবাড়ী সার্কিট হাউসে হয়েছে। দুটি প্রশিক্ষণে রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন গণমাধ্যমের মোট ৬৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

ডিআরইউ সদস্যদের জন্য অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)-এর সদস্যদের জন্য তিন দিনব্যাপী (৩০ জুলাই থেকে ১ আগস্ট ২০১৮) অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ পিআইবি'তে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১ আগস্ট প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক শফিকুল করিম সাবু ও ডিআরইউ সভাপতি সাইফুল ইসলাম। সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর।

পাবনায় শিশু ও নারী উন্নয়ন রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ

তথ্য মন্ত্রণালয়ের শিশু ও নারীবিষয়ক উন্নয়ন সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (৫ম পর্যায়)-এর সহযোগিতায় পাবনা জেলার সাংবাদিকদের জন্য দুই দিনব্যাপী শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭ সেপ্টেম্বর পাবনা প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। পাবনা প্রেস ক্লাবের সভাপতি শিবজিত নাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক মো. জসিম উদ্দিন, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, প্রেস ক্লাবের সম্পাদক আঁখিনুর ইসলাম রেমন, অর্থ সম্পাদক ড. নরেশ চন্দ্র মধু। প্রশিক্ষণে ২৬ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

মেরিন জার্নালিস্টদের জন্য প্রশিক্ষণ

মেরিন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের জন্য 'মেরিন ইকোলজি, ব্লু ইকোনমি অ্যান্ড কনজারভেশন' শীর্ষক তিন দিনব্যাপী (১০-১২ সেপ্টেম্বর) প্রশিক্ষণ প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ-পিআইবি'তে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের প্রথম দিনে রিসোর্সপারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব কবির বিন আনোয়ার। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। প্রশিক্ষণে মোট ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন বাসস-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ

পিআইবি-সোহেল সামাদ স্মৃতি পুরস্কার অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন এটুআই পলিসি অ্যাডভাইজার আনীর চৌধুরী

এটুআই-এর 'মুক্তপাঠ' পেয়েছে পিআইবি-সোহেল সামাদ স্মৃতি পুরস্কার- ২০১৮

গণমাধ্যম ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবন ক্যাটাগরিতে পিআইবি-সোহেল সামাদ স্মৃতি পুরস্কার-২০১৮ পেয়েছে এটুআই-এর মুক্তপাঠ। ৫ সেপ্টেম্বর প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। পিআইবি পরিচালনা বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি শফিকুর রহমান। সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. কাবেরী গায়েন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন পিআইবি'র মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর। এছাড়া বক্তব্য দেন এটুআই-এর পলিসি অ্যাডভাইজার আনীর চৌধুরী, সংবাদ পাঠক সমিতির সভাপতি দেওয়ান সাঈদুল হাসান ও প্রয়াত সোহেল সামাদের আত্মীয় সংবাদ পাঠক নিলুফার ইয়াসমীন করিম।

মুক্তপাঠের পক্ষে পুরস্কারের চেক, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন এটুআই প্রোগ্রামের পলিসি অ্যাডভাইজার আনীর চৌধুরী। এটুআই-এর মুক্তপাঠ একটি ই-লার্নিং প্লাটফর্ম। আইসিটি বিভাগ, ইউএনডিপি এবং ইউএসএইড-এর সহায়তায় এটুআই প্রোগ্রাম ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ই-লার্নিং প্লাটফর্মের ভালো দিকগুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অনলাইন সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ থেকে প্রায় ৬,০০০ সাংবাদিক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এ সাড়ার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি, আমাদের গণমাধ্যমকর্মীরা পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে আগ্রহী। তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের এ ধরনের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। সোহেল সামাদ সম্পর্কে তথ্যমন্ত্রী বলেন, সোহেল সামাদ একজন দক্ষ সাংবাদিক ছিলেন। নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর পরিবারের উদ্যোগে এ পুরস্কার চালু করা হয়েছে। পিআইবি এটির আয়োজন করে থাকে। তিনি বলেন, মুক্তপাঠ সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণে এক নতুন পদ্ধতি, যা সময় ও শ্রম কমিয়ে দিয়েছে। ই-লার্নিংয়ের মাধ্যমে সফলভাবে সাংবাদিক প্রশিক্ষণের কাজ পিআইবি এবং এটুআই করতে পেরেছে। তিনি বলেন, ঘরে বসে আমরা এ প্রশিক্ষণ নিতে পারছি। তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও গণমাধ্যমের মধ্যে একটা মিল আছে। গণমাধ্যম মানুষের সঙ্গে মানুষের এবং প্রশাসনের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগের মাধ্যম তৈরি করে দেয়। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং গণমাধ্যম হাত ধরে চলে। গণমাধ্যমকর্মীরা সাইবার অপরাধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চক্রান্তে লিপ্ত হলে তাতে গণমাধ্যমের পবিত্রতা নষ্ট হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি শফিকুর রহমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রশংসা করে বলেন, মাত্র ১০টি বছরে তিনি দেশকে কোথায় এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন আর উপহাসের বিষয় নয়। এখন তা বাস্তবে রূপ নিয়েছে। স্বাগত বক্তব্যে পিআইবি মহাপরিচালক মো. শাহ আলমগীর সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, সাংবাদিকতা শিক্ষায় মুক্তপাঠের ভূমিকা প্রশংসনীয়। মুক্তপাঠের মাধ্যমে ৬ হাজারের অধিক ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

কাবেরী গায়েন ই-লার্নিংয়ের উপযোগিতা ও মুক্তপাঠের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, এখন হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়তে হবে– এ জিনিস হারিয়ে যাচ্ছে। এখন ঘরে বসে হারবার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বই/জার্নাল পড়তে পারছি। আমরা একটা পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখলাম ৬,০০০ সাংবাদিককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলো ঘরে বসে। ই-লার্নিংয়ের মাধ্যমে আমরা অনেক উপকৃত হচ্ছি। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে– এমনটা আর নেই। ই-লার্নিং প্লাটফর্ম ভেঙে দিয়েছে সীমাবদ্ধতা। উন্মুক্ত করেছে জ্ঞানের জায়গাকে। তিনি বলেন, ই-লার্নিং আমাদের জন্য। ই-লার্নিং উন্নয়নের জন্য।

শ্যামল দত্ত বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের ফলে এখন গ্রাম ও শহরের দূরত্ব কমে গেছে। কেননা গ্রাম থেকে শহরে আসা একটা ঝামেলার কাজ। গ্রামে বসেই এখন অনলাইনে প্রয়োজনীয় কাজ করা যাচ্ছে।

নিলুফার ইয়াসমীন করীম সোহেল সামাদকে প্রশংসা করে বলেন, মাত্র ৩৮ বছর বয়সে তিনি চলে গেছেন। এ পুরস্কার যারা পেয়েছেন তারা এবং পিআইবি'র মাধ্যমে সোহেল সামাদ বেঁচে থাকবেন।

সভাপ্রধানের বক্তব্যে অধ্যাপক ড. সাখাওয়াত আলী খান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ এবং এটুআইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, অনেক উন্নয়নশীল দেশ থেকে আমরা অনেক এগিয়ে গিয়েছি। এখন আর আগের মতো নেই। টেলিফোন, টেলিগ্রামের জন্য মানুষের অপেক্ষা করতে হয় না। এখন তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। তরুণরা এই প্রযুক্তিকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গেছে। আমরা প্রবীণরা পিছিয়ে পড়েছি। তাই তরুণদের ওপর আমাদের ভরসা। তিনি বলেন, সাংবাদিকতার এই প্রশিক্ষণে নৈতিকতার ওপর জোর দিতে হবে। সাংবাদিকরা সবসময় সবাইকে খুশি করতে পারেন না। পপুলার সাংবাদিক হতে হবে– এমন কোনো কথা নেই। সত্য কথাটা নির্ভয়ে বলা এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া– এটিই সাংবাদিকতার আসল রূপ।

উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সাল থেকে প্রয়াত সাংবাদিক ও সংবাদ পাঠক সোহেল সামাদ স্মরণে একটি ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে পিআইবি প্রতিবছর এ পুরস্কার দিয়ে আসছে। সোহেল সামাদের পরিবার এই ট্রাস্টের সিডমানি দাতা। এ পুরস্কার ৫টি ক্ষেত্রে প্রদান করা হয়– অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন, প্রেস ফটোগ্রাফি, ফিচার/উপসম্পাদকীয়, গণমাধ্যম ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবন ও সাংবাদিকদের কল্যাণমূলক সেবা।

এটুআইয়ের মুক্তপাঠ অনলাইনে সাংবাদিকতা শিক্ষা দিচ্ছে। এছাড়াও এ প্লাটফর্ম ভবিষ্যতে বাংলাদেশে নানা বিষয়ে কোর্স পরিচালনা করার ব্যবস্থা নিচ্ছে। মুক্তপাঠ বাংলা ভাষায় নির্মিত একটি ই-লার্নিং প্লাটফর্ম, যেখান থেকে আগ্রহী যে কেউ যে কোনো বিষয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে। ২০১৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তপাঠের উদ্বোধন করেন।